A SYNTACTICAL STUDY OF THE BENGALI LANGUAGE

(বাংলা ভাষার বাক্যগঠন ঃ এক অধ্যয়ন)

A Thesis submitted to
UGC – NERO
for Minor Research Project
in
Arts (Bengali)

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

By

Dr. Joyanti Saha, M.A. (Double), M. Phil, Ph.D.
Associate Professor, Department of Bengali
Nowgong Girls' College
Nagaon, Assam, 782001
2015

A SYNTACTICAL STUDY OF THE BENGALI LANGUAGE

(বাংলা ভাষার বাক্যগঠন ঃ এক অধ্যয়ন)

A Thesis submitted to
UGC – NERO
for Minor Research Project
in
Arts (Bengali)

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

By

Dr. Joyanti Saha, M.A. (Double), M. Phil, Ph.D.
Associate Professor, Department of Bengali
Nowgong Girls' College
Nagaon, Assam, 782001
2015

Declaration of Candidate

I, Joyanti Saha solemnly declare that the thesis entitled "A SYNTACTICAL STUDY OF THE BENGALI LANGUAGE" was not submitted by me for any research degree to any other University or Institutions.

Joyanti Saha

Joyanti Saha

Place : Nagaon

Date :

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

শব্দসংক্ষেপ

০১. ভূমিকা ১-৫

০২. প্রাচীন বাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি ৬-১৪

০৩. আদি-মধ্য বাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি ১৫-২৮

০৪. অন্ত্য-মধ্য বাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি ২৯-৪১

০৫. আধুনিক বাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি ৪২-৬৩

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

০৬. বাংলা ও তার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত অপরাপর ভাষাগুলোর বাক্যগঠন পদ্ধতি সম্পর্কে তুলনামূলক অধ্যয়ন ৬৪-৭০

০৭. উপসংহার ঃ বাংলা ভাষার বাক্যগঠন পদ্ধতির মূল্যায়ন ৭১-৭২

গ্রন্থপঞ্জি ৭৩-৭৫

মুখবন্ধ

এই গবেষণা কর্মে আমার উৎসাহ বোধ করার কারণ চারটি। এক. বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব নিয়ে প্রচুর গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং বই লেখা হলেও বাংলা ভাষার বাক্যতত্ত্ব নিয়ে প্রবন্ধ ও বইয়ের অভাববোধ। দুই. বাংলা ভাষার বাক্যগঠনের উৎস ও বিকাশ এবং বর্তমানে তার স্থান অন্বেষণ। তিন. বিভিন্ন সময়ে বাংলা ও তার ভগিনী স্থানীয় ভাষাগুলোর মধ্যে আত্মিক যোগের ওপর আলোকপাত করা। চার. বর্তমানে বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার স্থান।

এক্ষেত্রে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন প্রফেসর শ্রী সুধাংশুশেখর তুঙ্গ এবং উষারঞ্জন ভট্টাচার্য মাহাশয়, তাঁদের মূল্যবান উপদেশ ছাড়া এই গবেষণা সম্পূর্ণ হত না। এই গবেষণা প্রকল্পে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন নগাঁও গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা ড০ অজন্তা দত্ত বরদলৈ বাইদেও — এঁরা সকলেই আমার নমস্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান আয়োগের গবেষণা প্রকল্পের (Minor Research Project) অধীন এই গবেষণার জন্য যে সকল গ্রন্থাগার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি সেগুলো হছে — এশিয়াটিক সোসাইটি (কলকাতা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (কলকাতা), জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ গ্রন্থাগার (গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং মহেশচন্দ্র দেব গোস্বামী গ্রন্থাগার (নগাঁও গার্লস কলেজ)। আমার এই কাজে তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করার জন্য আমি এই সকল গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারের সকল কর্মচারী বন্ধুদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ক্ষেত্র অধ্যয়নে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার সহকর্মী শ্রী রঞ্জয় সাহা। এঁদের সহযোগিতা ছাড়া আমার এ কাজ সম্পূর্ণ হত না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই গবেষণা কর্মে সহায় সহযোগিতা করা সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জয়ন্তী সাহা

শব্দসংক্ষেপ

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	অকুব
অসমিয়া	অস
আধুনিক বাংলা	আবা
উত্তম পুরুষ	উ. পু.
কৃত্তিবাসী রামায়ণ	কৃ. রা.
চর্যাপদ	চর্যা
প্রাচীন বাংলা	প্রাবা
প্রাচীন ভারতীয় আর্য	প্রভাআ
ভাষার ইতিবৃত্ত	ভাই
মধ্যম পুরুষ	মপু
মধ্য বাংলা	মবা
মধ্য ভারতীয় আর্য	মভাআ
রবীন্দ্র রচনাবলী	রর
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	শ্রীকৃকী
সাম্প্রতিক বাংলা	সা. বা.

প্রথম অধ্যায়

১. ভূমিকা

১.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বলাকা' কাব্যের "২৮ সংখ্যক" কবিতায় লিখেছেন ঃ

"পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান

তার বেশি করে না সে দান,

আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,

আমি গাই গান"[১]

সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই পাখির কণ্ঠে গান ছিল, মানুষ ছাড়া বিশ্বের সকল প্রাণীই তাদের কণ্ঠ থেকে নির্গত শব্দ বা ধ্বনি বা নাদ নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছে, কেবলমাত্র মানুষই তার প্রথম স্বর নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি। প্রতিনিয়ত জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনে দলবদ্ধ হয়েছে; এই দল বা সমষ্টি বৃহদাকার হয়ে নানা নিয়ম-নীতির মধ্যে দিয়ে সমাজের রূপ নিয়েছে। এই দলবদ্ধ মানুষ নিজেদের ভাবের আদান -প্রদানের তাগিদে তার স্বরের-লয়ের নানারকম উত্থান-পতন করে, দ্রুত-বিলম্বিত করে, কখনোবা আনুনাসিক করে নানারকমের ধ্বনির সৃষ্টি করেছে। এবং পরবর্তীকালে এক একটি ধ্বনিকে এক-একটি ভাবের বা বস্তুর প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে ; ব্যক্তিগতভাবে নয় দলবদ্ধভাবে। বিশেষ দল বা সমাজের মধ্যে এই প্রচলিত অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টিই হল ভাষা। অর্থাৎ সুকুমার সেনের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় — মানুষের মুখোচ্চারিত, অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।[২]

আমাদের দেশে একসময় সংস্কৃতকে দেবভাষা বলে মনে করা হত। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিকেরা বিজ্ঞাননিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন এইসব ভাষার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে. বাংলার ভাষাতাত্ত্বিকেরা কৃতিত্বের সঙ্গে বাংলা ভাষার উদ্ভব-বিকাশের ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন।

ইন্দো ইউরোপীয় থেকে ইন্দো-ইরানীয়, ইন্দো-ইরানীয়ে থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য, প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য, মধ্য ভারতীয় আর্য থেকে নব্য ভারতীয় আর্য। বাংলা এই নব্য ভারতীয় আর্যের অন্তর্গত একটি ভাষা। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্গত মাগধী প্রাকৃতের পূর্বী মাগধীর অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব।

১.২ বাংলা ভাষা ঃ

আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দর মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্টের নির্মোক ছেড়ে বাংলা ভাষার আবির্ভাব হয়। আবির্ভাবের পর থেকে নানা বিবর্তন-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা তার বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এই হাজার বছরের ইতিহাসকে সাহিত্যের ইতিহাসকার ও ভাষার ইতিহাসকারেরা মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন —

১. প্রাচীন বাংলা - (আনুমানিক ৯০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ)*

২. মধ্য বাংলা

ক. আদি-মধ্য বাংলা - (১৩৫০-১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ)

খ. অন্ত্য-মধ্য বাংলা - (১৪৫০-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) **

৩. আধুনিক বাংলা - (১৮০১ থেকে বর্তমান কাল অবধি)

১.৩ প্রাচীন বাংলা ঃ

বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দ (৯০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ), প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলতে বৌদ্ধ সহজিয়াদের রচিত চর্যাগীতিকা, সর্বানন্দ রচিত 'অমরকোষে'র টীকায় প্রদত্ত চার-শতাধিক বাংলা প্রতিশব্দ, বৌদ্ধকবি ধর্মদাস রচিত 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডণ' গ্রন্থের দু-চারটে কবিতা এবং 'সেক-শুভোদয়া'য় উদ্ধৃত দু-চারটে গান ও ছড়া।

১.৪ মধ্যযুগীয় বাংলা ঃ

১৩৫০ থেকে ১৭৬০ (কবি ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু) পর্যন্ত কালপর্যায়কে সাধারণভাবে মধ্যযুগীয় বাংলার সময়সীমা বলে মনে করা হয়। তবে এই কাল পর্যায়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়; ১৩৫০ থেকে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আদি-মধ্য বাংলা এবং অন্ত্য মধ্য বাংলার কালসীমা ১৪৫০ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধরা হয়।

১.৪.১ আদি-মধ্য বাংলা ঃ

আদি-মধ্য বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। রামায়ণ ও মহাভারতের কিছু কিছু অনুবাদ পঞ্চদশ শতকে করা হলেও পরবর্তীকালে মূলে হস্তক্ষেপ পড়ায় তাতে পঞ্চদশীয় বাংলার অকৃত্রিম রূপ আর থাকেনি। সুকুমার সেন বলেছেন, "তবে বড়ু চণ্ডীদাসের

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি তেমনি পুরোনো না হইলেও মূলে হস্তক্ষেপ খুব বেশি না পড়ায় আদি-মধ্য বাঙ্গালার পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায়।"[৩]

১.৪.২ অন্ত্য-মধ্য বাংলা ঃ

অন্ত্য-মধ্য বাংলায় রচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যের নানা ধারা। বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী, নাথ সাহিত্য, কিছু গাথাকাব্য, আখ্যানকাব্য। এছাড়া অনুদিত হয়েছে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত। গদ্যের মধ্যে আছে কিছু কেজো গদ্য।

এই পর্যায়ের অন্তর্গত ষোড়শ শতাব্দীকে বলা হয় ঐশ্বর্যের যুগ। কারণ এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়টি ধারা একই সঙ্গে প্রকাশিত হতে থাকে।

এই সময়ে বাংলা সাহিত্য নানা শাখায় পল্লবিত হয়ে উঠেছে এবং অনেক বড় বড় কবির উদ্যোগে ভাষাশিল্পও যথেষ্ট বর্ণোজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। যেমন — অনুবাদ-কাব্যের ধারায় কাশীরাম দাস, মঙ্গলকাব্য ধারায় মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়, বৈষ্ণব পদাবলী ধারায় জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, চৈতন্যজীবনী কাব্য ধারায় বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ, মুসলমানী সাহিত্যে দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল, শাক্ত পদাবলী ধারায় রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি কবিমনীষীদের আবির্ভাব এ যুগেই। এছাড়াও অনেক গৌণ কবিগণতো আছেনই যাঁদের অবদান ভাষা-চর্চায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১.৫ আধুনিক বাংলা ঃ

বাংলা ভাষা নিয়ে সবচেয়ে গভীর ও নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই কালপর্যায়ে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যযুগের অবসান এবং তারপর থেকেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে পণ্ডিতগণ মোটামুটি একমত। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে অধুনাতন সময় পর্যন্ত আধুনিক বাংলা ভাষার বিস্তৃতিকাল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দ, খ্রিস্টান মিশনারীদের রচনা, রামমোহন-বিদ্যাসাগর, মধু-হেম-নবীন, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, তারশঙ্কর-মানিক-কথাকারদের রচনা। সেই সঙ্গে বাংলার পাঁচটি প্রধান উপভাষা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্বিকদের পরীক্ষা নিরীক্ষা।

কালজয়ী সাহিত্যিকদের মনীষা-কৌলিন্যে বাংলা ভাষা বারবার বাঁক নিয়ে ব্যাপকতায়, গভীরতায়, বৈচিত্র্যময়তায় বিশ্বের সর্বাধিক চর্চিত ও প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে স্বমহিমায় স্থান করে নিয়েছে।

১.৬ আধুনিক বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল গদ্যের আবিষ্কার। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের বাহন ছিল পদ্য। তবে অন্যান্য নব্য-ভারতীয় ভাষাগুলোর তুলনায় বাংলা সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব বিলম্বিত। এর কারণ অনেক হতে পারে। শিশির কুমার দাশ এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন —

এক. ঐতিহাসিক কাল থেকেই শিক্ষিত বাঙালি সমাজে দ্বিভাষিকতার আধিপত্য। ফলে গদ্যের প্রয়োজনে তাঁরা সংস্কৃত গদ্যকে বেছে নিয়েছিলেন। যেমন - চর্যাগান লেখা হয়েছিল পদ্যে কিন্তু তার টীকা লেখা হয়েছিল সংস্কৃত গদ্যে, চৈতন্যজীবনী লেখা হয়েছিল পদ্যে কিন্তু তার টীকা লেখা হয়েছিল গদ্যে। কাজেই এটাও হতে পারে সংস্কৃত গদ্য বাংলা গদ্যের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দিয়েছিল। দুই দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে নিরক্ষর, লেখার কৌশল যেখানে মুষ্টিমেয় লোকের আয়ত্ত, পঠন-পাঠনের ধারা যেখানে মূলত মৌখিক, সেখানে গদ্যের প্রয়োজন বা ব্যবহার সংকীর্ণ হওয়া স্বাভাবিক।[৪] কারণ পদ্যের পরিমিত পদক্ষেপে, তালমানে গাঁথা বাক্যের স্বরণযোগ্যতা গদ্যের চেয়ে বেশি। তাই সাধারণ মানুষ হয়তো গদ্যের চেয়ে পদ্যকে বেশি সম্মান দিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। আর এজন্যই হয়তোবা মানুষের সামাজিক জ্ঞান পদ্যের বন্ধনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করে নিয়েছিল। তার প্রমাণ— প্রবাদ, ছড়া, যাদু, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুক ইত্যাদি প্রায় সবই নানা ধরণের পদ্যে রচিত। কেউ কেউ আবার এ কথাও বলেছেন যে বাংলা সহজ পয়ারের শোষণশক্তিই বাংলা গদ্যের প্রকাশকে বিলম্বিত করেছে।

তথ্যসূত্র

১. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, দেয়া-নেয়া, বলাকা, পৃ. ৭৪

২. ভাই, পৃ. ১৫

৩. তদেব, পৃ. ১৪৪

৪. দাশ. শিশির, গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব, পৃ. ১৮-১৯

বি.দ্র. — * বাংলা সাহিত্যে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতককে বন্ধ্যা যুগ বলা হয়। কারণ এই সময়ে রচিত কোন শিষ্ট সাহিত্য আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি।

** বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে দেখলে অন্ত্য-মধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু বাংলা ভাষার ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে এর স্থিতিকাল ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু সাল পর্যন্ত ধরাই যুক্তি সংগত বলে মনে হয়। তারপর আধুনিক যুগ শুরু।

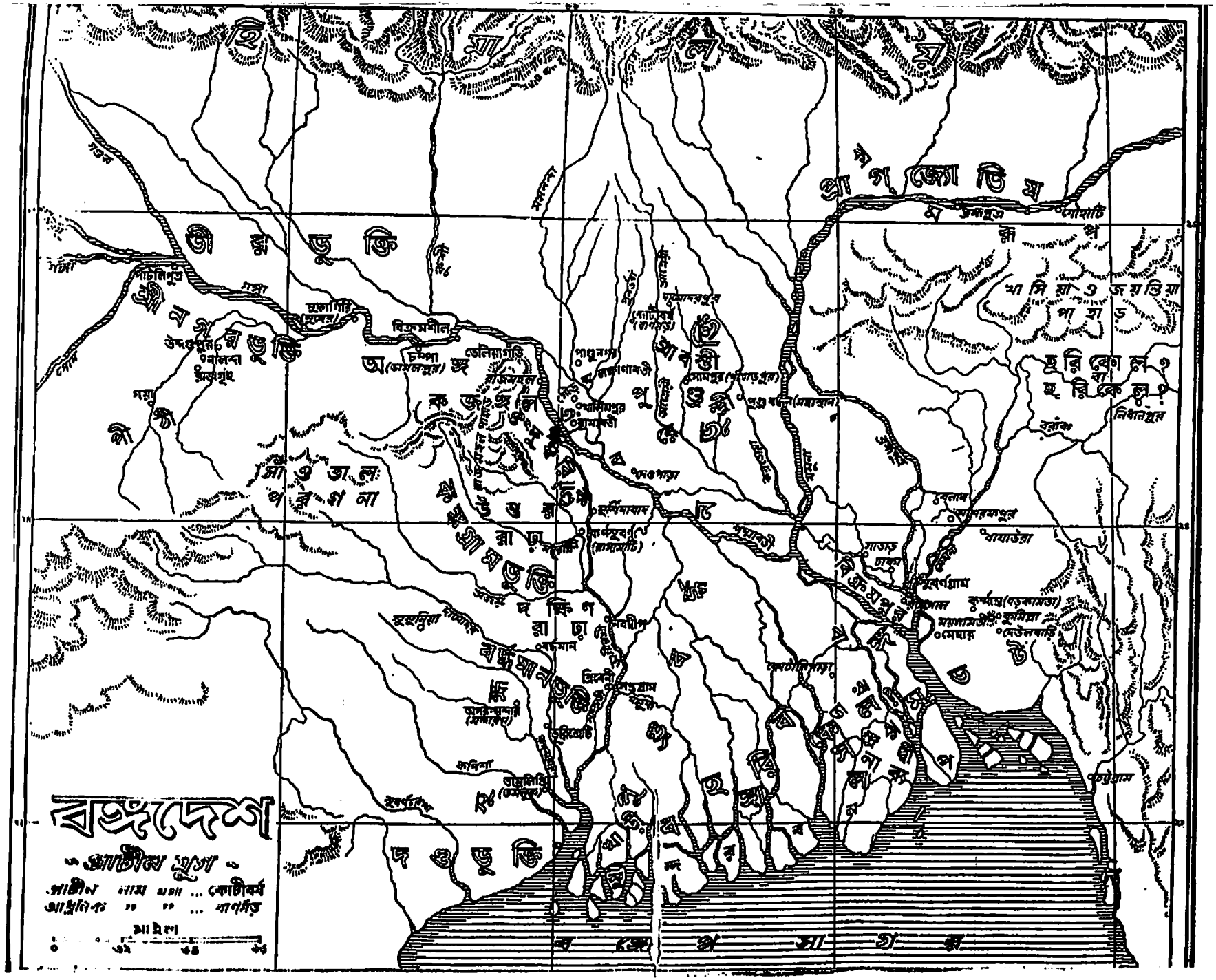

বঙ্গদেশ
প্রাচীন যুগ
প্রাচীন নাম যথা ... কোটীবর্ষ
আধুনিক " " ... বাণগড়
মাইল
হিমালয়
প্রাগ্‌জ্যোতিষ
গৌহাটি
খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়
হরিকোল বা হরিকেল
তীরভুক্তি
শ্রীনগরভুক্তি
পাটলিপুত্র
বিক্রমশীল
চম্পা
তেলিয়াগড়ি
রাজমহল
পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি
সোমপুর
সাঁওতাল পরগণা
বর্দ্ধমানভুক্তি
দক্ষিণ রাঢ়
তাম্রলিপ্তি
দণ্ডভুক্তি
বঙ্গ
সুবর্ণগ্রাম
ময়নামতী
মেহার
কুমিল্লা
চট্টগ্রাম
বঙ্গোপসাগর

দ্বিতীয় অধ্যায়
২. প্রাচীন বাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি

২.১ চর্যাপদ ঃ

বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার লাইব্রেরি থেকে এই পুথিটি আবিষ্কার করেন এবং ১৯১৬ সালে তারই সুসম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে আরও তিনটি পুথির সঙ্গে একত্রিত করে 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' এই নামে প্রকাশ করেন। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এর ভাষা, রচনাকাল, ধর্মতত্ত্ব, সমাজদর্শন ইত্যাদি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়। কেউ কেউ একে হিন্দি, প্রাচীন মৈথিলি, প্রাচীন উড়িয়া অথবা প্রাচীন অসমিয়া— অর্থাৎ বাংলা ছাড়া অপর একটি আধুনিক আর্য ভাষা বলে মনে করেন। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাগীতির ভাষা আলোচনা করে সুনিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন করেছেন যে এর ভাষা বাংলা। তিনি বলেছেন— "The language of the Caryās is the genuine vernacular of Bengal at its basis. It belongs to the early or old NIA stage."[১] আর এর রচনাকাল সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "Judging from the language, one would be inclined to place them at least 150 years before the 'Śri-Kṛṣṇa-Kīrttana', which belongs to the last quarter of the 14th century, and which is our oldest Middle Bengali text : roughly, before 1200 A.C."[২] সুতরাং হিন্দির দাবি উঠতেই পারে না। তবে বাংলা, অসমিয়া এবং উড়িয়া যেহেতু ভগিনী স্থানীয়া ভাষা অর্থাৎ মাগধী অপভ্রংশ (পূর্বী মাগধী) থেকে উদ্ভূত কাজেই চর্যাপদ বাংলায় রচিত হলেও তাতে কিছু কিছু অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষার উপাদান আছে যা সাধারণত এই তিন ভাষাতেই ব্যবহার হয় বা হত।

প্রাপ্ত পুথিতে মোট ৫০ টি পদ আছে, তার মধ্যে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের অর্থ উদ্ধার করা গেছে। তার মানে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বলতে এই সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ। এই সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের রচয়িতা ২২ জন সিদ্ধাচার্য।[৩] যাই হোক এই কটি পদ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে প্রাচীন বাংলা ভাষায় বাক্যগঠন পদ্ধতি কেমন ছিল।

২.২ ভাষায় বাক্যগঠন এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বাক্য অর্থাৎ যে পদ বা পদসমষ্টির দ্বারা কোনও বিষয়ে বক্তার ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়, সেই পদ বা পদসমষ্টিকে বাক্য বলে। প্রত্যেক ভাষাতেই বাক্যের মধ্যে প্রযুক্ত এই শব্দসমষ্টি আবার একটি নির্দিষ্ট ক্রমের অধীন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী শব্দকে বিভক্তি প্রত্যয় যোগে বাক্য মধ্যে ব্যবহার করা হয়। এই ক্রম ঠিক না হলে অর্থবোধে বা অর্থ গ্রহণে অসুবিধা হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা

হয়। যেমন— ইংরেজিতে / I go to school / বাংলায় / আমি স্কুলে যাই/। ইংরেজি বাক্যে প্রথমে কর্তা তারপর ক্রিয়া তারপর কর্ম। কিন্তু বাংলায় প্রথমে কর্তা তারপর কর্ম তারপর ক্রিয়া। তবে নব্য-ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলোর মধ্যে একটি সাধারণ মিল পরিক্ষিত হয়। কারণ এই ভাষাগুলো সবই প্রাচীন-ভারতীয়-আর্য ভাষা থেকে মধ্য-ভারতীয়-আর্য ভাষার মধ্য দিয়ে নব্য- ভারতীয়-আর্যে উপনীত হয়েছে। তাই এই গুচ্ছের ভাষাগুলোর মধ্যে একটি সাধারণ (common) বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষীত হয়। তবে পার্থক্য যে একেবারেই নেই তাও নয়। পার্থক্য যেটুকু আছে তা খুবই সামান্য। যেমন— বাংলার/আমি যাব না/, অসমিয়ায়/মই নাযাওঁ/, হিন্দি/ম্যায় নেহী যায়ুঙ্গী/। এখানে অর্থাৎ নব্য-ভারতীয়-আর্য (NIA) ভাষার অন্তর্গত বাংলা, অসমিয়া এবং হিন্দি এই তিনটি ভাষা থেকে যে তিনটি বাক্য উদ্ধৃত করা হল তাতে দেখা যায় যে কেবল নঞর্থক অব্যয়ের (Negative partical) স্থান পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ অসমিয়া এবং হিন্দিতে Negative partical verb- এর আগে বসেছে আর বাংলায় Negative partical Verb- এর পরে বসেছে। এছাড়া হিন্দিতে দেখা যায় যে কর্তা স্ত্রী-লিঙ্গ হলে তার ক্রিয়াও স্ত্রী-প্রত্যয় গ্রহণ করে। যেমন — রাম স্কুল যাতা হ্যায়; কিন্তু, সীতা স্কুল যাতি হ্যায়। বাকি সব একই। তবে এখানে একটি কথা বলাই বাহুল্য যে বাক্যগঠনে শব্দের এই বিন্যাস বা ক্রম গদ্যের ক্ষেত্রে যে রকম মানা হয় পদ্যের ক্ষেত্রে তা মানা হয় না। কারণ কবিকে ছন্দ ও অলংকারের কথাও ভাবতে হয়। কাব্য বা কবিতার মধ্যে লালিত্য বা বিষয়ের দাবি অনুযায়ী গাম্ভীর্য বা রূঢ়তা, বিরোধাভাস প্রভৃতি আনবার জন্য নানা ধরণের ছন্দ, অলংকার, প্রচলিত-অপ্রচলিত বিভিন্ন শব্দ কবি যখন বাক্যগঠন করেন, তখন তিনি (বা তাঁরা) কাব্যের স্বার্থেই বাক্যগঠনের সাধারণ নিয়ম অতিক্রম করে যান। অর্থাৎ প্রচলিত বা বৈয়াকরণিক নিয়মের বেড়াজাল ভঙ্গ করে থাকেন।

২.৩ চর্যাপদের গানগুলো আকারে প্রকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। অধিকাংশ গানই ১০ চরণে সমাপ্ত। তবে এর মধ্যে দুটি গান ১৪ চরণের, দুটি গান ১২ চরণের আর একটি গান ৮ চরণের। প্রত্যেকটি গানেরই প্রতি জোড়া চরণে চরণান্তিক মিল দেখা যায়। চর্যাপদে ব্যবহৃত ছন্দের নাম পাদাকুলক বা 'পজ্ঝটিকা', যা প্রাচীন প্রাকৃত অপভ্রংশ কবিতার ছন্দ থেকে এসেছে, যাকে বর্তমানের ভাষায় বলা যায় প্রত্ন মাত্রাবৃত্ত রীতির স্বগোত্র। যেহেতু এগুলো এক একটি গান বা ছোট ছোট কবিতা তাই এখানেও সবসময় বাক্যের প্রচলিত শব্দ-ক্রম পরিলক্ষিত হয় না। কখনও কর্তা, কখনও কর্ম বাক্যের শেষে বসেছে। যেমন—

১. ভবনই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী। (চর্যা- ৫)

২. হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জানী। (চর্যা- ৬)

৩. জে জে আইলা তে তে গেলা। (চর্যা- ৭)

৪. বেঙ্গ সংসার বড়্হিল জাঅ।

দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায়।। (চর্যা- ৩৩)

৫. নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ। (চর্যা- ৪৯)

উদ্ধৃত বাক্যগুলোতে ক্রিয়া বাক্যের প্রথমে এবং কর্তা বাক্যের শেষে বসেছে। এরকম নিদর্শন চর্যাপদে আরও আছে।

২.৩ সরলবাক্য ঃ

চর্যাপদে সরলবাক্যের নিদর্শনই বেশি, যেমন— 'সোণে ভরিতী করুণা নাবী' (চর্যা- ৮)

অনেক বাক্যে আবার কথ্য বাংলার ঢঙে সাধু গদ্যের ছাপ পাই। যেমন—

'আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী।' (চর্যা- ৪৯)

অর্থাৎ ভুসুকু আজ তুই বাঙালি হইলি। এছাড়া বাক্যের প্রথাগত দুই উপাদান— উদ্দেশ্য ও বিধেয়, সে দুটিও আছে। বাক্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে তাতে কর্তাখণ্ড ও ক্রিয়াখণ্ড এই দুটি ভাগ থাকে। কর্তাখণ্ডে থাকে বিশেষ্য বা বিশেষ্যগুচ্ছ এবং সর্বনাম, আর ক্রিয়াখণ্ডে থাকে ক্রিয়াপদ, স্থানবাচক ও কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ, গৌণকর্ম ও মুখ্যকর্ম। উদ্ধৃত বাক্যটিও সেইভাবেই বিন্যস্ত। যেমন— 'ভসুকু' উদ্দেশ্য, 'বাঙ্গালী ভইলী' বিধেয়। আবার অপরদিকে 'ভুসুকু', 'বাঙ্গালী' কর্তাখণ্ড; ক্রিয়াখণ্ড হল 'আজি, ভইলী'।

২.৫ জটিলবাক্য ঃ

জটিলবাক্যের নিদর্শনও চর্যাপদে দুর্লক্ষ্য নয়। জটিলবাক্য হল যে বাক্যে একটি প্রধান বাক্যের সঙ্গে অন্য এক বা একাধিক অপ্রধানবাক্য অন্বিত থাকে। যা অব্যয় বা সর্বনাম দিয়ে যুক্ত হয়। যেমন—

ক. 'হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।' (চর্যা- ৬)

সা.বা.- হরিণী হরিণাকে বলে হরিণা শোনো।

এখানে 'হরিণী হরিণাকে বলে' এটাই মুখ্য বাক্য, অপ্রধান অনুজ্ঞাসূচক বাক্য হল 'হারিণা শোনো তো', কাজেই এটা জটিল বাক্য। এরকম উদাহরণ আরও আছে। যেমন—

খ. 'কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।' (চর্যা- ১৪)

সা.বা.- (ডোম্বী) কড়িও নেয় না, পয়সাও নেয় না; সে স্বচ্ছন্দে পার করে দেয়।

গ. 'নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।' (চর্যা- ২৮)

সা.বা.- নানা তরুবর মুকুলিত হলো, গগনে ডাল লাগলো।

ঘ. 'তিঅ-ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী' (চর্যা- ২৮)

সা.ব.- তিন ধাতুর খাট পাতা হলো, শবর মহাসুখে শয্যা বিছালেন।

২.৬ যৌগিকবাক্য ঃ

জটিলবাক্যের পাশাপাশি চর্যাপদে যৌগিকবাক্যও দেখা যায়। তবে যৌগিক বাক্যের অন্বয়সূচক অব্যয় অনুপস্থিতিও পরিলক্ষিত হয়। ভাবের সাহায্যে অন্বয়সূচক অব্যয়ের খাটতি পূরণ করা হয়েছে। যেমন—

'পাঞ্চ কেড়ুয়াল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী' (চর্যা- ১৪)

সা.বা.- পাঁচটি কেঁড়ুয়াল নৌকার মার্গে পড়েছে এবং পিঠে (ছাদে) কাছি (খুলে) বেঁধে রাখা হয়েছে।

২.৭ প্রশ্নবাচক বাক্য ঃ

যে বাক্যের দ্বারা কোন প্রশ্ন করা হয় তাই প্রশ্নবাচক বাক্য। সচরাচর প্রশ্নবোধক বাক্যে প্রশ্নবাচক সর্বনাম বা অব্যয় বা বিশেষণ থাকে, প্রশ্নবোধক বাক্যের এটা একটা শর্ত, আবার লক্ষণও এছাড়া প্রশ্নবাচক বাক্যের শেষে এটা প্রশ্নচিহ্ন থাকবে। তবে চর্যাপদের প্রশ্নবাচক বাক্যের শেষে প্রশ্নবাচক চিহ্ন নেই। ছন্দের খাতিরে থাকার কথাও নয়। এছাড়া প্রশ্নবাচক চিহ্ন ছাড়া প্রশ্নবাচক বাক্য রচনা বাংলা ভাষার এক বৈশিষ্ট্যও বটে। আমাদের ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনায় এর বিস্তর উদাহরণ আছে। যেমন—

ক. 'এই অকূল বানান-পাথারের মধ্যে গুরুমহাশয় যে আমাদের কর্ণ ধরিয়া চালান করেন, তাহার কম্পাসই বা কোথায়, তাহার ধ্রুবতারাই বা কোথায়।'

খ. 'মাস্টার মশায় psalm শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিলে কিরূপ হৃৎকম্প হইত, তাহা আজও কি ভুলিতে পারিয়াছি।'[৪]

চর্যাপদের প্রশ্নবাচক বাক্যও অনেকটা এইরকম, প্রশ্নচিহ্নহীন প্রশ্নবাচক বাক্য। যেমন—

ক. কাহৈরি ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস। (চর্যা- ৬)

সা.বা.— কাকে গ্রহণ করে কাকে ছেড়ে কি করে আছ।

খ. গেলী জাম বহুড়ই কইসেঁ।। (চর্যা- ৮)

সা.বা.— গতজন্ম কিসে ঘুরে আসে।

গ. জামে কাম কি কামে জাম। (চর্যা- ২২)

সা.বা.— জন্ম হইতে কর্ম, কি কর্ম হইতে জন্ম।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি প্রশ্নচিহ্নহীন প্রশ্নবাচক বাক্য। প্রশ্নচিহ্নহীনতা ভাবপ্রকাশে বাধা হয়ে দাড়ায়নি।

২.৮ অনুজ্ঞাবাক্য ঃ

অনুজ্ঞা কথাটার আভিধানিক অর্থ আদেশ বা অনুমতি। কিন্তু অনুজ্ঞাবাক্য বলতে শুধু আদেশমূলক বাক্যই বোঝায় না। সেইসঙ্গে অনুরোধ বা প্রার্থনার ভাবযুক্ত বাক্যকেও বোঝায়।[৫] চর্যাপদ তান্ত্রিক বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন প্রণালী তথা সাধন পদ্ধতি বিষয়ক কতগুলো পদসমষ্টি বা কবিতাবলী, যেখানে আছে গুরুর আদেশ-উপদেশ, অনুরোধ ইত ্যাদি। যেমন—

ক. দিত করিঅ মহাসুহ পরিমাণ। (চর্যা- ১)

সা.বা.— দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ কর।

খ. বাহ তু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছী।।
মাঙ্গত চহ্নিলে চউদিস চাহঅ।। (চর্যা- ৮)

স.বা.— সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করে কামলি তুমি নৌকা বাও, মার্গেতে চড়ে তুমি চারদিকে দৃষ্টি রাখ।

গ. গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ নিঅ মনে বাণেঁ। (চর্যা- ২৮)

সা.বা.— গুরুবাক্যকে ধনু করে, নিজের মনকে বাণে বিদ্ধ করো।

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে চর্যাপদে ব্যবহৃত অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে পদক্রমের বিপর্যাস কম হয়েছে। এধরণের বাক্যে পদের অবস্থান আধুনিক বাংলার কাছাকাছি। তবে এটা বলা যাবে না যে সেই সময়ের কথ্য ভাষা এরকমই ছিল। এক. চর্যাপদ পদ্যে লেখা। দুই. কথ্যভাষা আর লেখ্য ভাষায় পার্থক্য সর্বদেশে সর্বকালে বিদ্যমান। তিন. সেই সময়ের ভাষা বলতে আমাদের হাতে কেবল এই সাড়ে ছেচল্লিশটি কবিতা। কেবল মাত্র কয়েকটি কবিতার উপর বিচার বিশ্লেষণ করে সেই যুগের সেটাই সকলের ব্যবহৃত ভাষা এটা বল মনে হয় বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে। তবে হ্যাঁ অনুসন্ধান এবং অনুমানের উপর নির্ভর করে আভাস একটা পাওয়া যেতেই পারে।

২.৯ নিষেধাত্মকবাক্য ঃ

নঞর্থক শব্দ, নঞর্থক ক্রিয়া বা নঞর্থক অব্যয়ের সাহায্যে যে বক্তা আদেশ করেন তাই নিষেধাত্মক বাক্য। চর্যাপদ সেহেতু এক ধর্মীয় চর্যায় গুরু-শিষ্যের আচরণ ও মুক্তির উপায় অনুসন্ধানের কাব্য সেহেতু সেখানে দুচারটা নিষেধাত্মক বাক্য থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি! এবার অনুসন্ধান করে দেখা যাক চর্যাপদে নিষেধাত্মক বাক্য কেমন ছিল। নিষেধাত্মক বাক্যে ব্যবহৃত পদক্রমই বা কেমন।

ক. নিঅড্ডী বোহি দূর ম জাহী।। (চর্যা- ৫)

সা.বা.— নিকটেই বোধি আছে, দূরে যেয়ো না।

খ. বাম দাহিন দুই মাগ ন রেবই বাহ তু চ্ছন্দা।। (চর্যা- ১৪)

সা.বা.— বাম ও ডান এই দুই পথে সচেতন হয়ে উঠ না।

গ. উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি। (চর্যা-২৮)

সা.বা.— উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, ভুল করো না।

অপূর্ব! বিশেষ্যের বিশেষণ তখনও বিশেষ্যর পূর্বে বসত এখন বিশেষ্যের পূর্বেই বসে (স্থান বিশেষে পরেও বসে)। এখানে এই পদক্রমের বিপর্যাস হয়নি। তবে নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসেছে, যা এখন বসে না। এখন বেশিরভাগ সময় নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পরেই বসে। এরও একটি ইতিহাস আছে যা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

২.১০ কর্মভাববাচ্য ঃ

চর্যাপদে বেশ কায়কটি বাক্য কর্মবাচ্যে গঠিত হয়েছে। যেমন—

'আলিএঁ কালিএঁ বাটা রুন্ধেলা'। (চর্যা- ৭)

সা.বা.— আলি ও কলিতে বা আলি ও কালির দ্বারা পথ রুদ্ধ হলো।

বাক্যটিতে পদক্রমের কোন বিপর্যাস হয়নি। বর্তমানেও কর্মবাচ্যের পদক্রম এমনই। বিভক্তির রকমফের হয়েছে এবং কখনো কখনো বিভক্তিস্থানে বর্তমানে অনুসর্গ ব্যবহৃত হয় মাত্র।

২.১১ প্রবাদবাক্য ঃ

চর্যাপদে এমন দু-একটি প্রবাদ বাক্য আছে। যার অর্থ এবং ব্যবহারযোগ্যতা আজও প্রাসঙ্গিক।

ক. অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। (চর্যা- ৬)

সা.বা.— হরিণের নিজের মাংসই হরিণের শত্রু।

অপূর্ব চিত্রকল্প! কাব্যের চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে এধরণের প্রবাদ বাক্য চর্যাপদগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোঁছে দিয়েছে। বাক্যটির আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে বাক্যটিতে কোন ক্রিয়াপদ নেই। অথচ বাক্যটি সম্পূর্ণ এবং সরলবাক্য। ক্রিয়াপদ এখানে উহ্য। বর্তমানেও বাংলায় এধরণের ক্রিয়া পদ হীন সরলবাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন— তুমি ভাল/সীতা সুন্দরী/ইত্যাদি। অর্থাৎ বাংলা বাক্যগঠনের এই প্রক্রিয়া তার জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসছে। উদ্ধৃত বাক্যটির পদক্রমও সুবিন্যস্ত। এরকম সুবিন্যস্তিত পদক্রম দ্বারা গঠিত প্রবাদবাক্য চর্যাপদে আরো আছে যা ধাঁধা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

ক. নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ। (চর্যা- ৩৩)

সা.ধা.— প্রতিদিন শিয়াল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

আমরা সকলেই জানি যে বাক্যগঠনে পদক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম পদক্রমের বিপর্যাস হলে

বাক্য ভাবের বাহন হওয়ার যোগ্যতা হারায়। শ্রোতার মনে আসক্তি বা আকাংক্ষা জন্মায় না। চর্যাপদের বাক্যগঠন দেখলে মনে হয় সেইসময়ের এই প্রতিভাশালী কবি-সিদ্ধাচার্যরা বাক্যগঠন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তারমানে সেই সময়েই অর্থাৎ মাগধী অপভ্রংশের সদ্য নির্মোকমুক্ত বাংলা ভাষা তার নব এবং সুশৃংখল বাক্যগঠন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। যেমন, উদ্ধৃত বাক্যটিতে দেখি প্রথমে কালবাচক শব্দ, তারপর কর্তা, তারপর কর্ম, তারপর ক্রিয়া বিশেষণ, তারপর ক্রিয়া— এক সুন্দর ক্রম। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে আজ থেকে হাজার বছর আগে বাংলা ভাষার বাক্যগঠনে এত সুন্দর এবং অনেকক্ষেত্রে পরিণত ক্রম অনুসরণ করা হত। যা ভাষার বাক্যগঠনের প্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলা আনে।

২.১২ বাগ্‌ধারা বা শব্দগুচ্ছ ঃ

চর্যাপদের বাক্যগঠনে এমন কিছু বাগ্‌ধারা বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে বা বাংলা ছাড়া অন্য কোন নব্য-ভারতীয়-আর্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যেমন— শব্দগুচ্ছ বা যুক্ত ক্রিয়াপদ— সড়ি পড়িআ, উঠি গেল, নিদ গেল, গুণিআঁ লেহুঁ, ধরন ন জাই, কহন ন জাই ইত্যাদি। বাগ্‌ধারা— 'হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী', 'বর সুণ গোহালী কিমো দুঠ্ঠ বলন্দেঁ', 'দিবসে বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ/রাতি ভইলে কামরু জাঅ' ইত্যাদি।

২.১৩ লিঙ্গ ঃ

চর্যাপদের বাক্যগঠনে ব্যবহৃত পদগঠনে দেখা যায় যে বিশেষ্য স্ত্রী লিঙ্গ হলে বিশেষণ এমনকি ক্রিয়াও স্ত্রী-প্রত্যয় গ্রহণ করে। যেমন— হাড়েরী মালী, নিশি অন্ধরী মুষার চারা ইত্যাদি। আবার 'ইল' প্রত্যয়ান্ত অথবা 'এর' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ কখনো কখনো স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নিয়েছে। যেমন— 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী', 'নানা তরুবর মউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী', 'নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ' ইত্যাদি। হিন্দিতেও এমনটা আছে। যেমন— 'লেড়কা সোনা', কিন্তু 'লেড়কী সোনি' ইত্যাদি। তাই চর্যাপদের বিশেষ্য অনুযায়ী বিশেষণের লিঙ্গ পরিবর্তন দেখে কেউ কেউ — যেমন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর 'হিন্দী কাব্যধারা' নামক গ্রন্থ চর্যাপদ গুলোকে সংযুক্ত করেছেন।[৬] এ সম্পর্কে অতীন্দ্র মজুমদার এক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, 'চর্যাপদে ব্যবহৃত বাংলাভাষায় পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহারের নিয়ম অপভ্রংশের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত।'[৭]

২.১৪ বাক্যে ব্যবহৃত নঞর্থক ক্রিয়া এবং নঞর্থক অব্যয় ঃ

চর্যাপদের বাক্যগঠনে ব্যবহৃত পদক্রমে আমরা দেখি যে নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হয় এবং নঞর্থক ক্রিয়ার Negative partical-ও মূল ক্রিয়া পদের পূর্বে বসে। যেমন— ধরণ ন জাই, নাহি নিসারা, দুআন্তে চিখিল মাঝোঁ ন মাহী, নিঅড়ডী বোহি দূর ম জাহী, নিলঅ ন

জানী ইত্যাদি। ক্রিয়ার পূর্বে নঞর্থক অব্যয়ের এরূপ ব্যবহার দেখে কেউ কেউ বলেন যে চর্যাপদ প্রাচীন অসমিয়া ভাষায় লিখিত।[৮]

আমাদের বক্তব্য হল বাংলা ভাষায় বর্তমানে বেশির ভাগ সময় নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পরে বসে ঠিকই। কিন্তু সব সময় ক্রিয়ার পরে বসে না। যেমন—

ক. আমার না আছে টাকা, না আছে লোকবল।

খ. এমন কথা না বলাই উচিত।

গ. তুমি ওটা চাইলে না বলব না।

ঘ. না যায় না যাবে।

ঙ. আমটা টক না মিষ্টি।

অপরদিকে অসমিয়া ভাষায় সবসময় নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসে না বা নঞর্থক ক্রিয়ার partical ক্রিয়ার পূর্ব বসে না। যেমন—

ক. ময় ভাত খোৱা নাই।

খ. ময় কলিকাতাত যোৱা নাই।

গ. তুমি খেলিবলৈ গৈছিলা নে? ইত্যাদি।

২.১৫ চর্যাপদে প্রাপ্ত বরাক উপত্যকার উপাদান ঃ

চর্যাপদে ব্যবহৃত অনেক বৈশিষ্ট্য বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষায় এখনও বর্তমান। যেমন, চর্যাপদের ন্যায় লিঙ্গানুশাসন বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষায় দেখা যায়। যেমন—

ক. আমরার বাড়িত তাই আইলি কুন্‌তা কইলিও না, গেলিগি।

খ. নটিপুড়ি, ভাগিসলি, একবার নি তিনতে বার।[৯]

২.১৬ পরেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে, অপভ্রংশ-সম্পৃক্ত আঞ্চলিক মাগধী অপভ্রংশ (কল্পিত) অথবা আন্তর্ভারতীয় শিষ্ট অবহট্‌ঠ নয়, বাঙলা ভাষার জননী হলো আঞ্চলিক কথ্য প্রাকৃত (প্রাকৃত বৈয়াকরণদের সংজ্ঞানুযায়ী দেশী বা লৌকিক)। আর অনুমিত এই আদর্শ কথ্য প্রাকৃতের আঞ্চলিক বিভেদ ও বৈচিত্র্য অঙ্গীকার করেই জন্মলাভ করেছে অন্যান্য আধুনিক ভাষাগুলি।"[১০] কিন্তু আমরা জানি যে অবহট্‌ঠের লক্ষণ বা উপদান চর্যাপদে আছে। যেমন— চর্যাপদে ব্যবহৃত নেতিবাচক অব্যয় 'মা' অবহট্‌ঠের লক্ষণ। সুকুমার সেন বলেছেন, "কথ্য সংস্কৃত হইতে কথ্য প্রাকৃত এবং ক্রমে তাহা হইতে বাঙ্গালার উৎপত্তি।"[১১]

পরিশেষে তাই এটাই বলতে চাই যে উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। বাংলা ভাষার বাক্যগঠনের

তুলনাত্মক লিপিচিত্র

রোমান	প্রাচীন বাংলা (চর্যা পুথি)	মধ্য-বাংলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)	আধুনিক বাংলা ও অসমীয়া	মৈথিলী	ওড়িয়া	নাগরী	নেওয়ারী
a	অ	অ	অ	𑒁	ଅ	अ	𑐀
ā	আ	আ	আ	𑒂	ଆ	आ	𑐁
i	ই	ই	ই	𑒃	ଇ	इ	𑐂
ī	ঈ	ঈ	ঈ	𑒄	ଈ	ई	𑐃
u	উ	উ	উ	𑒅	ଉ	उ	𑐄
ū	ঊ	ঊ	ঊ	𑒆	ଊ	ऊ	𑐅
e	এ	এ	এ	𑒋	ଏ	ए	𑐊
o	ও	ও	ও	𑒍	ଓ	ओ	𑐌
ka	ক	ক	ক	𑒏	କ	क	𑐎
kha	খ	খ	খ	𑒐	ଖ	ख	𑐏
ga	গ	গ	গ	𑒑	ଗ	ग	𑐐
gha	ঘ	ঘ	ঘ	𑒒	ଘ	घ	𑐑

রোমান	প্রাচীন বাংলা (চর্যা পুথি)	মধ্য-বাংলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)	আধুনিক বাংলা ও অসমীয়া	মৈথিলী	ওড়িয়া	নাগরী	নেওয়ারী
ca	চ চ	চ	চ	𑒔	ଚ	च	𑐔
cha	ছ	ছ	ছ	𑒕	ଛ	छ	𑐕
ja	জ	জ	জ	𑒖	ଜ	ज	𑐖
jha	ঝ	ঝ	ঝ	𑒗	ଝ	झ	𑐗
ña	ঞ	ঞ	ঞ	𑒘	ଞ	ञ	𑐘
ṭa	ট	ট	ট	𑒙	ଟ	ट	𑐚
ṭha	ঠ	ঠ	ঠ	𑒚	ଠ	ठ	𑐛
ḍa	ড	ড	ড	𑒛	ଡ	ड	𑐜
ḍha	ঢ	ঢ	ঢ	𑒜	ଢ	ढ	𑐝
ṇa	ণ	ণ	ণ	𑒝	ଣ	ण	𑐞
ta	ত	ত	ত	𑒞	ତ	त	𑐟
tha	থ	থ	থ	𑒟	ଥ	थ	𑐠

রোমান	প্রাচীন বাংলা (চর্যা পুথি)	মধ্য-বাংলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)	আধুনিক বাংলা ও অসমীয়া	মৈথিলী	ওড়িয়া	নাগরী	নেওয়ারী
da	দ	দ	দ	𑒠	ଦ	द	𑐡
dha	ধ	ধ	ধ	𑒡	ଧ	ध	𑐢
na	ন	ন	ন	𑒢	ନ	न	𑐣
pa	প	প	প	𑒣	ପ	प	𑐥
pha	ফ	ফ	ফ	𑒤	ଫ	फ	𑐦
ba	ব	ব	ব	𑒥	ବ	ब	𑐧
bha	ভ	ভ	ভ	𑒦	ଭ	भ	𑐨
ma	ম	ম	ম	𑒧	ମ	म	𑐩
ya	য	য	য	𑒨	ଯ	य	𑐫
ra	র	র	র,ৰ	𑒩	ର	र	𑐬
la	ল	ল	ল	𑒪	ଲ	ल	𑐮
śa	শ	শ	শ	𑒬	ଶ	श	𑐱
ṣa	ষ	ষ	ষ	𑒭	ଷ	ष	𑐲
sa	স	স	স	𑒮	ସ	स	𑐳
ha	হ	হ	হ	𑒯	ହ	ह	𑐴
ṃ	ং	ং	ং	𑓀	ଂ	ं	𑑄

রোমান	প্রাচীন বাংলা (চর্যা পুথি)	মধ্য-বাংলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)	আধুনিক বাংলা ও অসমীয়া	মৈথিলী	ওড়িয়া	নাগরী	নেওয়ারী
ḥ	ঃ	ঃ	ঃ	𑓁	ଃ	ः	𑑅
n	ঁ	ঁ	ঁ	𑒿	ଁ	ँ	𑑃
kṣa	ক্ষ	ক্ষ	ক্ষ	𑒏𑓂𑒭	କ୍ଷ	क्ष	𑐎𑑂𑐲
ṅka	ঙ্ক	ঙ্ক	ঙ্ক	𑒓𑓂𑒏	ଙ୍କ	ङ्क	𑐒𑑂𑐎
kra	ক্র	ক্র	ক্র	𑒏𑓂𑒩	କ୍ର	क्र	𑐎𑑂𑐬
1	১	১	১	𑓑	୧	१	𑑑
2	২	২	২	𑓒	୨	२	𑑒
3	৩	৩	৩	𑓓	୩	३	𑑓
4	৪	৪	৪	𑓔	୪	४	𑑔
5	৫	৫	৫	𑓕	୫	५	𑑕
6	৬	৬	৬	𑓖	୬	६	𑑖
7	৭	৭	৭	𑓗	୭	७	𑑗
8	৮	৮	৮	𑓘	୮	८	𑑘
9	৯	৯	৯	𑓙	୯	९	𑑙
10	১০	১০	১০	𑓑𑓐	୧୦	१०	𑑑𑑐

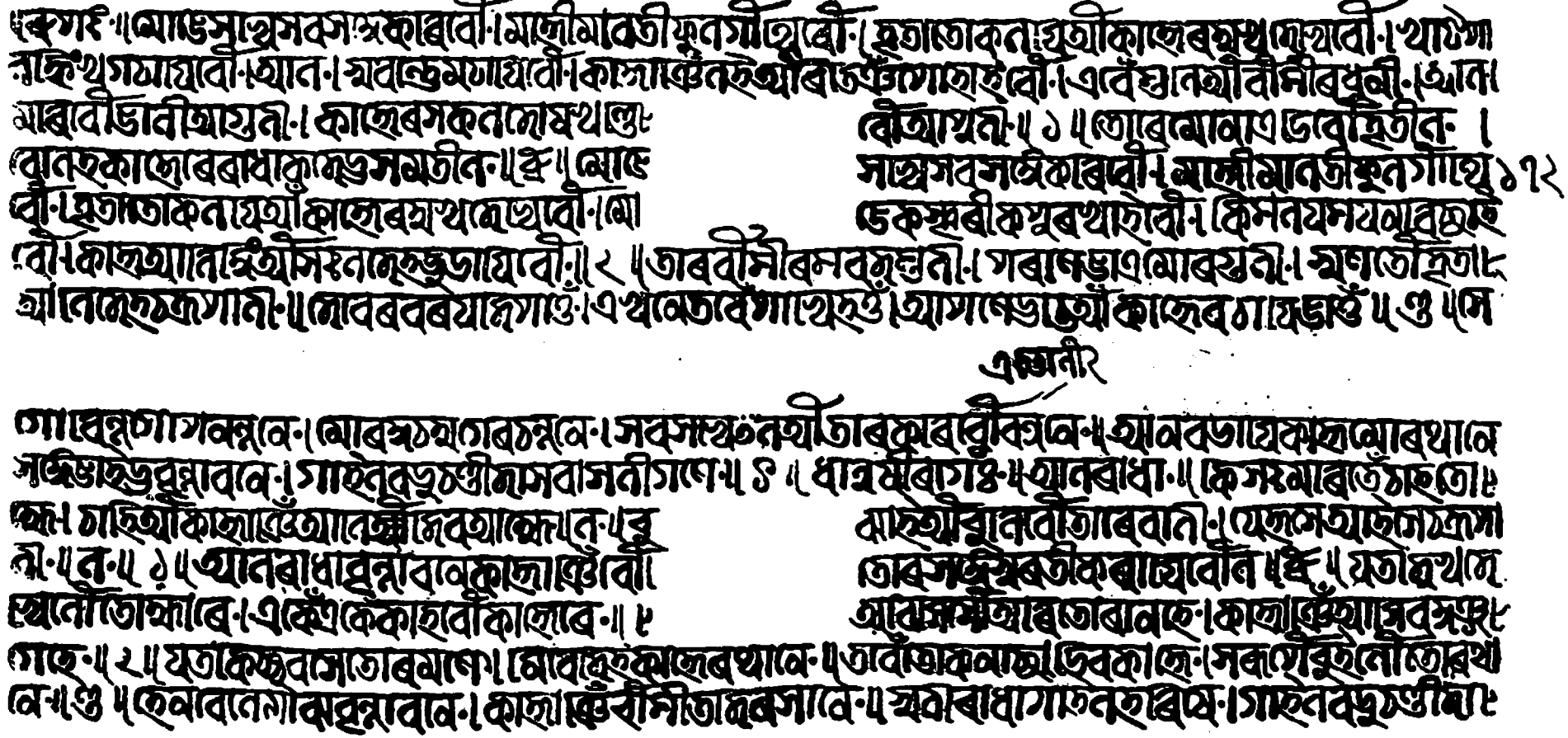

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুইখানি পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়
৩. আদি-মধ্য বাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি

৩.১ বন্ধ্যাযুগ ঃ

আমরা জানি যে চর্যাপদ রচিত হয়েছিল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়ে। সুকুমার সেন অনুমান করেন সে আদি-মধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৩৫০-১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দ।[১] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ও আদি-মধ্য যুগের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দেড়শ-দুশ বছরের। এই দুশ অর্থাৎ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দে বাংলা শিষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন কি! সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "১২০০ হইতে ১৪৫০ অব্দের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন নিদর্শন তো নাই-ই বাঙ্গালা ভাষারও কোন হদিশ পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে বাঙ্গালায় লেখা বই ও গান যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে অনুমান হয় যে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়াতেই বাঙ্গালা ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর পরিচিত রূপ ধারণ করিয়াছিল।"[২] সাহিত্যের অপর এক ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "খ্রীঃ ১৩ শ থেকে ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই দুর্যোগ চলেছিল অব্যাহত গতিতে। এই যুগ বাংলার সংস্কৃতির 'তামস যুগ' য়ুরোপের 'তামস যুগের' চেয়ে শতগুণে নঞর্থক, ভয়াবহ ও মানবধর্মবর্জিত পশুবৃত্তির স্বচ্ছন্দ পদচারনা।"[৩]

৩.২ রচনাকাল (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন) ঃ

এদিকে সুকুমার সেন তাঁর ভাষার ইতিবৃত্তে বলেছেন, "তবে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথি তেমনি পুরানো না হইলেও মূলে হস্তক্ষেপ খুব বেশি না পড়ায় আদি-মধ্য বাঙ্গালার পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায়।"[৪] উপরে উল্লিখিত সুকুমার সেনের মন্তব্য দুটির মধ্যে বিরোধাভাস আছে। তবে ভাষার ইতিবৃত্তে উল্লেখিত দ্বিতীয় যুক্তিটি বেশি গ্রহণযোগ্য তথা যুক্তিসঙ্গত বলে আমাদের মনে হয়। এখন প্রশ্ন হল ১৩৫০ থেকে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ এই একশ বছরের মধ্যে কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচিত হয়েছিল? কোন কোন সমালোচক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে প্রতিকূল মত দেওয়ার পরেও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষাকে কোন মতেই ১৪০০ বা ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী বলা যায় না।[৫] চৈতন্যজীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লেখ করেছেন ঃ

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।।[৬]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যিনি চৈতন্য সমসাময়িক ছিলেন তিনি বলেছেন যে তিনি নিজে এবং চৈতন্য আনন্দের সঙ্গে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নাট্যগীতি লক্ষণাক্রান্ত পালাগুলো আস্বাদন করতেন। তারমানে বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি, চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে। কাজেই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন তার আগেই রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৩.৩ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বাক্যগঠন ঃ

উপরোক্ত প্রমাণের সাহায্যে এটাই বলতে পারি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত ভাষা এবং তার বাক্যগঠন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গদেশে প্রচলিত বাংলা ভাষার বাক্যগঠন।

এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে কেমন ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা ভাষার বাক্যগঠন— যখন তার বয়স মোটামুটি ৫০০ বছর, এবং চর্যাপদের সঙ্গে তার বয়সের ব্যবধান প্রায় আড়াইশ বছর। এবার দেখা যাক এই আড়াইশ বছরে বাক্যগঠনের দিক থেকে এই কাব্য অর্থাৎ কাব্যের ভাষা কতটা সাবালক হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নাট্যগীতি লক্ষণাক্রান্ত পালা কাব্য। তাই এখানেও বাক্যে ব্যবহৃত সঠিক পদক্রম সবসময় পরিলক্ষিত হয় না। কখনও কর্তা কখনও কর্ম বাক্যের শেষে বসেছে এবং ক্রিয়া বাক্যের শুরুতেই বসেছে। যেমন—

ক. সুন সুন রাধা চন্দ্রাবলী পৃ.৯৭

খ. বোলহ রাধারে মোর পরাণ বড়ায়ি। পৃ.৯৬

উদ্ধৃত বাক্য দুটিতে ক্রিয়া বাক্যের প্রথমে এবং কর্তা বাক্যের শেষে বসেছে। এরকম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রচুর। তবে অনেক বাক্যেই বাংলার সাধুগদ্যের নিদর্শন বর্তমান। যেখানে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার সন্নিবেশ একদম আধুনিক বাংলারই মত। যেমন—

ক. প্রথমত কংশে পুতনাক নিয়োজিল। পৃ. ৩
খ. পাপ দুঠ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব।। পৃ.২
গ. দিনে দিনে বাঢ়ে তনু লীলা। পৃ.৩

প্রত্যেকটিই সুন্দর সরলবাক্য। শুধু তাই নয় দেখা যায় যে বিশেষ্য বা নামপদের বিশেষণ বিশেষ্যর পূর্বেই বসেছে, আর ক্রিয়ার বিশেষণও ক্রিয়ার পূর্বে সুনির্দিষ্ট স্থানে বসেছে। যেমন—

ক. আম্মোহো ভাল গারুড়ী।। পৃ.৩৯

খ. নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীবে। পৃ.৩

গ. রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।। পৃ.১

এই ক্রমের ব্যতিক্রমও হয়েছে, ছন্দের স্বার্থে। যেমন—

ক. ভ্রাহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি। পৃ.৩

তবে ক্রিয়া বিশেষণের ক্ষেত্রে বিশেষণটি বেশিরভাগ সময় ক্রিয়ার পূর্বেই বসেছে। যেমন—

ক. সত্বরে পসিলা সাগরের জলে মাঝে।। পৃ.৫

বাক্যের মূল আকর্ষণ আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতাকে ধরে রাখা, সেক্ষেত্রে এই কাব্যে ব্যবহৃত সকল বাক্যই তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কালের দরবারে জয়ী।

৩.৪ সাধারণভাবে বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ক. সরলবাক্য, খ. জটিলবাক্য, গ. যৌগিকবাক্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত বাক্যগুলোকেও আমরা এই তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। আর এর মধ্যের সরলবাক্যই বেশি, যা আমরা পূর্বেই বলেছি। তবুও আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার তাগিদে একটি মাত্র উদাহরণের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করব।

৩.৪.১ সরলবাক্য (Simple Sentence) :

যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় (সমাপিকা ক্রিয়া) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন—

ক. দিনে দিনে বাঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ।। পৃ. ২

খ. দুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকীর উদরে।। পৃ. ২

প্রশ্নবোধক বাক্যেও এই সরলতা দেখা যায়। যেমন —

কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ। পৃ. ৫

৩.৪.২ জটিলবাক্য (Complex Sentence) : যখন কোন বাক্যে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় অর্থাৎ কর্তা ও সমাপিকার মুখ্য অংশ ব্যতীত এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ড বাক্য বা বাক্যাংশ থাকে — এই অপ্রধান অংশ প্রধান বাক্যেরই অংশ বা অঙ্গ-স্বরূপ, এতে সমাপিকা ক্রিয়া থাকে না, বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও 'যে/সেরূপ/যেমন' প্রভৃতি পদের সহায়তায় উপস্থিত হয়। কিন্তু, প্রধান বাক্যাংশেই অর্থপূর্তি ঘটে তাকেই মিশ্র বা জটিলবাক্য বলে। এরকম বাক্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে একেবারেই নেই তা নয়। যেমন —

ক. এভোঁ নাইল সে ত নান্দের পূত। পৃ. ১২২

খ. প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর।। পৃ. ১৯

গ. ভাল ভারী আণিলেহেঁ সংসারে বাছিআঁ। পৃঃ ৭১

ঘ. যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ

দশনরুচি তেহ্মারে। পৃঃ ৮৫

প্রথম তিনটি জটিলবাক্যের উদাহরণে দেখা যায় যে বাংলা গদ্যের উপর যেন শুধু পদ্যের ছায়া। অর্থাৎ পদ্য একেবারে গদ্যের কাছাকাছি এসে গেছে। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যে এই গদ্য এই বাক্যগঠনেরই কাছাকাছি ছিল তৎকালীন যুগের সেই অঞ্চলের ব্যবহৃত ভাষা।

শিশিরকুমার দাশ বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের পদ্যে দেখব তার ওপরে গদ্যের গঠনের চাপ।

আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে।
বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে।।
কথা হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।
একলী বুলসি কোহ্নে বৃন্দাবন মাঝে।।
গোষ্ঠ হৈতে আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী।
আগুত চলিলী মোর সুন্দরী নাতিনী।।
পাছে পাছে যাইতে পথ হারাইল আহ্মি।
মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি।।
সঙ্গে কোহ্ন লআঁ বুল নাতিনী খানি।
কথা তাক হারাইলে কহ তত্ত্ববাণী।।
কি নাম তাহার কোহেন তার রূপ।
আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ।।
দধি বিকে জাইতে সঙ্গে মথুরা নগরী।
বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্য সুন্দরী।।
নাতিনী হারাইলোঁ নামে চন্দ্রবলী।
কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী।।

চণ্ডীদাস যে এই রকম পদ্যচরণ লিখেছেন তা নিতান্তই প্রথাবশত। একটা প্রথা দাঁড়িয়ে

গিয়েছিল যে সাহিত্য বা যাকে আমরা সাহিত্য বলি এমন রচনা লিখতে হলে পদ্যেই লিখতে হবে।"[৭]

৩.৪.৩ যৌগিকবাক্য (Compound Sentence) :

দুটি বা দুয়ের অধিক সরল বা মিশ্র অথবা সরল ও মিশ্র বাক্যকে সংযোজক অব্যয়ের (consjuctives) সাহায্যে সংযুক্ত করে একটি দীর্ঘ বাক্য গঠন করা হলে তাকে যৌগিকবাক্য বলে (compound sentence)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যৌগিকবাক্য অনেক আছে। যেমন —

ক. তোর মুখে সুনী রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে। পৃ.৭

খ. নটক কাহাঞিঁ যবেঁ নাহিঁ লএ দাণে।
তবে কি করিব বড়ায়ি চিন্তহ আপণে।। পৃ.৪৮

গ. মাইলেঁ মুকতি কিবা সুরপুরে জাইএ।। পৃ. ৪৯

ঘ. আবথা করিল মোর যে জগন্নাথে।
পুনরপি পড়িলাহোঁ তাহার হাথে।। পৃ. ৫৮

ঙ. যদি গাঙ্গ উজান বহে।
তভোহোঁ তোহ্মার বোল নহে।। পৃ. ২১

চ. যাবত পবনে ঢেউ নাহিঁ বান্দে পাণী।।
তাবত তোহ্মাক পার করোঁ না বাহিআঁ। পৃ. ৬১-৬২

ছ. যেই খনে কাহ্নাঞিঁ দেখিবোঁ।
তখনেই তাক না এড়িবোঁ।। পৃ. ১৩৫

ঞ. যখন শরতরৌদে ধরিলেক ছাতী।
তখন বোলায়িলেঁ রাধা আপণাক সতী।। পৃ.১২০

এরকম উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অজস্র যেখানে বিভিন্ন ধরণের অব্যয় দিয়ে বাক্যকে সংযোগ করা হয়েছে। নাট্যগীতি লক্ষণাক্রান্ত এই পালাকাব্যটির মূল চরিত্র তিনটি — কৃষ্ণ, রাধা আর বড়াই। এই তিনজনের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে কাব্য ঘটনা অগ্রসর হয়েছে। হয়তো সেজন্যই বড়ু চণ্ডীদাসের মত একজন শক্তিশালী এবং উদার কবি তাতে তৎকালীন লোকমুখে প্রচলিত ভাষার কাছাকাছি একে এনে দাঁড় করিয়েছেন। কারণ আমরা জানি যে নাটক দৃশ্যকাব্য, সেই সঙ্গে শ্রুতিকাব্যও বটে, কাজেই দর্শক-শ্রোতার দিকে লক্ষ্য করেই হয়তো তিনি এইধরণের দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কারণ আমরা জানি - 'একাকী গায়কের নহে তো গান —।'

৩.৫ কর্মবাচ্য গঠন (Passive construction) :

বাচ্য তিন প্রকারের —

ক. কর্তৃ বাচ্য খ. কর্ম বাচ্য গ. ভাববাচ্য

কর্তৃবাচ্য ঃ যে বাক্যে (বাচ্যে) ক্রিয়াপদটি কর্তার সঙ্গে প্রধানভাবে অন্বিত হয়, অর্থাৎ কর্তার পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরষ হয়, সে স্থলে ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্য (Active voice) হয়। যেমন —

আমি স্কুলে গেলাম।

সে স্কুলে গেল। ইত্যাদি

কর্তৃবাচ্য সর্বাবস্থায় সকল ক্রিয়ার সঙ্গেই (সকর্মক - transitive ও অকর্মক - intransitive) গড়ে উঠতে পারে, এটা অনেকটা সরলবাক্যের মতই সহজ সরল।

অন্যদিকে কর্মবাচ্য (Passive voice) - এর গঠনকৌশল একটু ভিন্ন। কর্মবাচ্য কেবল সকর্মক ক্রিয়ার সঙ্গেই গড়ে ওঠে। এবং বাক্যটিতে ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মই প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয়। যেমন — 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'[৮] এখনে কর্তা উহ্য। অর্থাৎ এক কথায় কর্তাহীন বাক্য এবং যেখানে কর্তাই প্রধান তাই কর্মবাচ্য।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ থেকেই কর্মবাচ্য এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কারণ এর দ্বারা বক্তার মনের ভাবকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সংস্কৃতে এই কর্মবাচ্যের - এর ক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট বিভক্তিও (বিকিরণ) ছিল। এ সম্পর্কে S.S. Tunga বলেছেন, "This is *ya* which is used in the present stem, 3 Per., *atmanepada.* The *ya* becomes *ijja* in MIA and *ia* in NIA. Thus the root *Kṛ* takes the form of *Kṛyate* in Sanskrit and *Karijjai* in Apabhramsa whence *Kariai* in early NIA language *** The affix *ia*, however, falls afterwords to merge

with/i/and /e/ of the 1 and 3 Per. sing."[৯]

যেমন, সংস্কৃতে আছে —

ক. বালিকায়া অশ্বাঃ দৃশ্যন্তে

খ. শিশুনা চন্দ্রঃ দৃশ্যতে। ইত্যাদি

বৌদ্ধগান ও দোহায় আছে —

ক. কাসু কহিজ্জই পৃ. ১৯৮

খ. গচ্ছ পুরাণেঁ বাখানিজ্জই পৃ.১৭৭ (<* ব্যাখ্যান্তে)

(It is described by Purana)

গ. সো পরমেসরু কাসু কহিজ্জই পৃ.১৯১

(the supreme lord [to be] described)?

চর্যাপদে আছে —

ক. নউ খর জালা ধূম ন দিশই চর্যা-৪৭

(দৃশ্যতে > দিশজ্জই > দিসই)

খ. পিঠা দুহিএ এ তিনা সাঁঝ্যে।। (চর্যা-৩৩)

(দুধ্যতে > দুহিএ)

গ. সকল সহিঅ কাহি করিঅই। (চর্যা-১)

ক্রিয়তে > করিজ্জই > করিঅই)

খ. হরিণা হরিণির নিলঅ ন জানি। (চর্যা-৬)

এমন উদাহরণ চর্যায় প্রচুর, সুনীতিকুমার চাটার্জির মতে, /ইঅ/ কর্মবাচ্য পুরোপুরি মাগধী প্রত্যয় এবং এটা প্রাচীন বাংলা ও মধ্য বাংলায় প্রায়ই ব্যবহৃত হত। উদাহরণ — কাহি করিঅই (চর্যা-১), খুর ন দীসঅ (চর্যা-৬), পাবিঅই (চর্যা-২৬), ভাবিঅই (চর্যা-২৬) ইত্যাদি।[১০]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্মবাচ্যের উদাহরণ প্রচুর। যেমন —

ক. আইহন বীর তিন লোকেঁ ভালে জাণী পৃ. ২২

খ. কথো দূরে গিআঁ দেখিএ একখানি নাএ পৃ. ৫৭

গ. দান সাধিত্র রতিপতি আশে পৃ. ২৩

ঘ. বোলেঁ চালেঁ না পাইএ পরার রমণী পৃ. ৭২

ঙ. সোণা ভাঙ্গিঁলেঁ আছে ঊপাএ

জুড়িএ আগুন তাপে।

পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে

জুড়িএ কাহার বাপে।। পৃ. ১৪৫

এরকম উদাহরণ আরো অনেক আছে। কাব্যটি মোট তেরোটি খণ্ডে বিন্যস্ত। তাই উদাহরণও বিস্তর।

এই /ইঅ/বিকিরণ (Middle affix) কখনো কখনো কর্মবাচ্য গঠনে /ইউ/রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই /ইঅ/যুক্ত কর্মবাচ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্মের অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করেছে। যেমন —

ক. আনহ সকল সখিজন মেলী করিউ যুগতী। পৃ. ৮০

খ. আমৃতেঁ সিঞ্চিউ দুই আখী।। পৃ. ৭৮

গ. তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে।। পৃ. ৮০

ঘ. পসার সাজিঊ দধি দুধে পৃ. ৫৬

ঙ. তথা বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে। পৃ. ১২২

চ. যমুনাক যাইউ রাধা লয়িআঁ সখিগণে। পৃ. ১০০

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "This ইউ <-iu> form is certainly the passive imperative : in force it is generally optative or imparative. In an example like বাঁশী চোরায়িতে করিউ যতনে। *** the ইউ <-iū> affix is the second MIA. imperative passive 3rd Pers. Singular affix <-Tadu> as in Śaurasenī (and Māgadhi) <Kaddhīadu, Karīadu (Kaliadu), suṇiadu (śuṇīadu)> = <Kathyatām, Kariyatām, śrūyatām>, <-īadu>giving the later form <-iaii> and <*-iu>). [১১]

তবে এটা ঠিক এসকল কর্মবাচ্য গঠনের উৎস যাই হোক প্রাচীন আর্য ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কর্মবাচ্য আপন গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই ধারাবাহিকভাবে পরবর্তীকালের ভাষাসমূহে (মধ্য ভারতীয় আর্য থেকে নব্য ভারতীয় আর্য) আপন মহিমাময় ভাস্বর। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য আদি মধ্য বাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি আর এই সময়কালের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্মবাচ্যের উদাহরণ যে প্রচুর তা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বড়ু চণ্ডীদাস নিজ মুন্সীয়ানায় এইধরণের প্রচুর বাক্য তাঁর কাব্যে রচনা করেছেন।

৩.৬ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাক্যগঠনে নঞর্থক ক্রিয়া ঃ

আর্য ভাষা সমূহে নঞর্থক ক্রিয়া (Negative verb), নঞর্থক অব্যয় (Negative Particle) যোগে গঠিত হয়। নঞর্থক অব্যয় অনেকটা প্রত্যয়র মত। বেশিরভাগ আর্য ভাষাসমূহে তা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। এবং নঞর্থক অব্যয় যোগ করলে মূল ক্রিয়ার কোন পরিবর্তন হয় না। কেবল অর্থের পরিবর্তন হয়। আর তাহল মূল ক্রিয়া অস্তর্থক (affirmity) থেকে নঞর্থকে (Negativity) পরিবর্তিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে (বৈদিকে) নঞর্থক ক্রিয়ার (Negative verb) জন্য ব্যবহৃত নঞর্থক অব্যয়ের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। তা ক্রিয়ার আগেও বসত, পরে বসত না। নব্য ভারতীয় আর্য (NIA) ভাষার অন্তর্গত মাগধীয় ভাষাগুচ্ছের অন্তর্গত সকল ভাষাতেই (আধুনিক বাংলা বাদে) নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার আগে বসে। এমনকি প্রাচীন বাংলা (চর্যাপদ) এবং আদি মধ্য যুগের বাংলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) পর্যন্তও নঞর্থক ক্রিয়ার অর্থসূচক নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বেই বসত। যেমন —

কণ্ঠ ন মেলঈ (চর্যা-১৮), কিম্পি ন হোন্তি (চর্যা-২২), খণহ ণ ছাড়অ (চর্যা-১৯), খড়তরি নো হোই আমি বুজিঅ (চর্যা-১৫), জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো (চর্যা-২২), ণ জাণী (চর্যা-২৯), সুনা পান্তর উহ ন দিসই ভান্তি ন বাসসি জাংতে (চর্যা-১৫) ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স্পষ্টত ব্যবহৃত তিনটি নঞর্থক অব্যয় হল — ন, না/না, নাহি/নাহিঁ। এর মধ্যে /না/ প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। যেমন সংস্কৃতে — সঃ অএ ন আগতম। আর /না/ এবং /নাহি/ র উৎস দুটি। প্রফেসর সুধাংশুশেখর তুঙ্গ এ দুটি উৎস সম্পর্কে বলেছেন যে,

"The most common negative particle in Magadhan languages is na lengtended from *na* in OIA. ... Another particle is *nāi*, which has two origins: one is *nāsīt*, was not, a negative verb (copulative) in the past tense in OIA, which fell as *nāhi* in PKt. Whence *nāhi* and *nāi* in NIA; another is *nāsti*, is not, the same copulattive verb but in the present tense, which gives *natthi* in MIA whence through an intermediate *nahhi* the present nai."[১২]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে /না/হচ্ছে /নাহি/ বা /নাই/ এর পরবর্তীকালের নতুন রূপ। বা এটাকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় যে /না/ হচ্ছে /ন/-এর প্রসারিত রূপ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নঞর্থক অব্যয় /ন/ সর্বাবস্থায় ক্রিয়ার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়েছে। কখনো কখনো /না/-ও সন্ধিবদ্ধ হয়েছে। যেমন —

বর্তমান কাল ঃ উ.পু/তোহ্মাক না দেখি/পৃ.৭; /না জানো/পৃ.১২১; Present indefinite-এ /না পায়িঞাঁ/পৃ. ১২১ ইত্যাদি। তৃতীয় পুরুষে - /কাহ্নাঞি কাপড় না পিন্ধে/পৃ.৪৮, ইত্যাদি।

বর্তমান অনুজ্ঞা ঃ

ম.পু./কচাল না পাত তোহ্মে /পৃ. ৪৫,

তৃতীয় পুরুষ /না বোল না বোল নিরাস বড়ায়ি/পৃ.৭ ইত্যাদি।

অতীত কাল ঃ

উ. পু./কথাহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে/পৃ.১২১,

তৃতীয় পুরুষ /তোহ্মাক না পাআঁ কাহ্ন হৈলা আচেতনে/পৃ. ৯ ইত্যাদি

ভবিষ্যৎ কাল ঃ

উ.পু. /না জাইব/পৃ.৪৮, /না জীবো/পৃ.৯, /না থাকিব/পৃ.১০ ইত্যাদি।

তৃতীয় পুরুষ /রাধা না করিবে নেহে/পৃ. ৭ ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ঃ

/না বুলিহ/পৃ.১০ এরকম উদাহরণ আরো আছে।

নঞর্থক অব্যয় /নাহি/ও ক্রিয়ার পূর্বে বসত। উদাহরণ /নাহি পুরে কাহ্নাঞিঁর প্রথম যৌবন/পৃ.৪৮। আবার কখনো কখনো /নাহি/এবং /নহে/একাই নঞর্থক ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করত। যেমন —

ক. আঅর বোলসি আহ্মাত বাকী নাহীঁ।। পৃ.৪৬

খ. কিছু উপায় নাহীঁ।। পৃ. ৪৭

গ. মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী। পৃ.৪৮

ঘ. লোক ধরমে নাহিঁ কথাঁহো হেন শুণী। পৃ. ৪৫

এধরণের উদাহরণ আরো আছে। সাম্প্রতিক বাংলা ভাষায় এগুলোর ব্যবহারিত রূপ হল - কোন উপায় নাই/নেই; সে তোর যোগ্য নয়/নহে ; সে ভাল নয় / নহে ইত্যাদি।

এখানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায় যে নঞর্থক ক্রিয়ার অর্থসূচক নঞর্থক Particle সর্বাবস্থায় ক্রিয়ার পূর্বে বসেছে। আধুনিক অসমিয়ায়ও নঞর্থক অব্যয় নঞর্থক ক্রিয়ার পূর্বেই বসে তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, তার রূপ একই থাকে। কিন্তু অসমিয়া ভাষায় নঞর্থক ক্রিয়ার নঞর্থক Particle যখন ক্রিয়ার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয় তখন সেই নঞর্থক particle তার ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রথম বর্ণের স্বর সেই particle গ্রহণ করে। যেমন —

affermative	Negative
কৰা	নকৰা
কিনা	নিকিনা
উঠা	নুউঠা
শুনা	নুশুনা ইত্যাদি।

তবে অসমিয়া ভাষাতেও ক্রিয়ার অতীত কালে Negative particle ক্রিয়ার পরেই বসে। যেমন — /কলি ময় ঘৰত অহা নাই /;/সি তাঁলৈ যোৱা নাই/ইত্যাদি।

বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বর্তমান বাংলার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাক্যগঠনের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য আছে। আর সেটি হল, নঞর্থক ক্রিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'চর্যাপদ' এমন কি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' নঞর্থক ক্রিয়ার অর্থসূচক নঞর্থক অব্যয় সবসময় ক্রিয়ার পূর্বে বসে। কিন্তু বর্তমানের শিষ্ট বাংলা সাহিত্যে এবং চলিত কথ্য বাংলা ভাষায় নঞর্থক অব্যয় সবসময় ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন- করব না, খাব না, করবে না, খাবে না, যাবে না, করবি না, খাবি না ইত্যাদি। তবে বর্তমানেও বাংলা কবিতায় ছন্দমিলের জন্য কখনো কখনো নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন —

বিপদে ঘোরো রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা

বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪নং কবিতা, গীতাঞ্জলি)[১৩]

গ. এবে দেহে মোর নাহি বিকার পৃ. ১৪২

ঘ. তোহ্মে আহ্মে আছি এথাঁ আর কেহো নাহী।। পৃ. ৬২

বর্তমানের আধুনিক বাংলাতের এরূপ ব্যবহার আছি। কেবল কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। যেমন — আমার কলম নাই/নেই; সে ঘরে নাই/নেই ইত্যাদি। অসমিয়ায় — মোৰ কলম নাই; সি ঘৰত নাই ইত্যাদি।

এই নাহি /নাহী ছাড়াও আদি-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার বাক্যগঠনে আরেকটি নঞর্থক অব্যয় পুরাঘটিত বর্তমান কালে ব্যবহৃত হত। সেটি হচ্ছে — 'নাহিক' পৃ. ২৬, ৭২, ৭৬, ১২৭/'নাহিক' পৃ. ১৬, ২০, ২৮, ২৯ ইত্যাদি। 'ক' এখানে স্বার্থিক প্রত্যয়।

৩.৮ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মাধ্যমে আদি মধ্য যুগের ভাষা বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে বাংলা ভাষা তখনই তার স্বমহিমায় ভাস্বর। সে সাবালক। আর তার সাবালকত্ব প্রকাশিত হয়েছে বড়ু চণ্ডীদাসের অপূর্ব শব্দ চয়নে, বাক্যগঠনে! যে বাক্যগঠন তার উত্তবসূরীদেরও দীর্ঘদিন প্রভাবিত করেছে। পদ্যের উপর গদ্যের চাপ অন্ত্য মধ্য যুগের কবিদের কাব্যের বাক্যগঠনেও দেখা যায়। যেমন — কৃত্তিবাসের রামায়ণে, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে।

তথ্যসূত্র

১. ভাই, পৃ. ১৪৪

২. সেন. সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), পৃ. ৮১

৩. অকুব, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড), পৃ. ২৫৩

৪. ভাই, পৃ. ১৪৪

৫. চট্টোপাধ্যায়. সুনীতিকুমার, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পৃ. ১৫

৬. কবিরাজ. কৃষ্ণদাস, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, পৃ. ১৩০

৭. দাশ. শিশিরকুমার, গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ, পৃ. ২১-২২

৮. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, "সোনারতরী", সোনারতরী, পৃ. ১

৯. Tunga. S.S., BORDSA, P.-301

১০. ODBL, Pp. 912-913

১১. ibid, p.920

১২. Tunga. S.S., BORDSA, P.-312

১৩. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, ৪নং কবিতা, গীতাঞ্জলি ; পৃ. ১৮

১৪. তুঙ্গ. সুধাংশুশেখর, বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা ঃ ষোড়শ-অষ্টাদশ শতক, পৃ. ৭৩, ১৭৮

বি.দ্র.- ১. আলোচনায় ব্যবহৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর উদ্ধৃতিগুলো বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (পঞ্চম সংস্করণ) থেকে নেওয়া।

২. বৌদ্ধগান ও দোহার উদাহরণগুলো হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

৪. অন্ত্য মধ্য বাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি

৪.১ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক থেকে দেখলে অন্ত্য মধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৪৫০ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়ের অন্তর্গত ষোড়শ শতাব্দীকে বলে বাংলা সাহিত্যির ঐশ্বর্যর যুগ। কারণ চর্যাপদ তারপর বন্ধ্যাযুগ তারপর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তারপরেই এই ষোড়শ শতাব্দীতে একই সঙ্গেঁ সাহিত্যের চারটি ফল্গুধারা বাংলাভাষা-সাহিত্যে বইতে শুরু করেছিল (কারণ যাই হোক)! সাহিত্যের এই সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখলে আমরা দেখতে পাই যে — মঙ্গল কাব্যের ধারা, অনুবাদ সাহিত্যির ধারা, বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা, চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের ধারা একই সঙ্গে এই ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত হচ্ছিল। সেইসঙ্গে কিছু কেজো গদ্য - যা দলিল দস্তাবেজ ও চিঠি-পত্রে পাওয়া যায়।

বাক্যগঠনের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় যে অন্ত্য-মধ্য বাংলায় রচিত কাব্য সমূহে ব্যবহৃত বাক্যের বাক্যগঠন অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত পদক্রম আদি মধ্য বাংলারই মত। তবে হ্যাঁ, কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে। সেইসঙ্গে বেশ কিছু বিদেশি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছে। যা আদি মধ্য বাংলা ভাষায় ছিল না (দু-চারিটি আরবী-ফার্সী শব্দ বাদ দিলে)।

আদি-মধ্য বাংলা ভাষায় যেমন সরলবাক্য জটিলবাক্য, মিশ্র বা যৌগিকবাক্যের নিদর্শন পাই — অন্ত্য মধ্য বাংলা কাব্যের ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। ব্যতিক্রম আছে তার ধ্বনিতে, তার রূপতত্ত্বে। ব্যতিক্রম অর্থাৎ একটু একটু করে পরিবর্তনের দিকে এগেচ্ছিল মাত্র। তবে আমূল পরিবর্তন নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের তাগিদে যতটুকু হওয়ার ততুটুকুই। আসল কথা হল বড়ু চণ্ডীদাসের মত শিক্ষিত, উদার প্রতিভাশালী কবিকে এক লহমায় টপকে যাওয়া বা তাঁর তৈরী ভাষার কাঠামো থেকে বেরিয়ে যাওয়া হয়তো সম্ভবও নয়। আর আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাক্যগঠনের বিশ্লেষণে দেখেছি যে বাংলা ভাষা তখনই তার নিজস্ব রূপ মোটামুটি নিয়ে নিয়েছে। উক্তি-প্রত্যুক্তিতে লেখা আদি মধ্য যুগর এই কাব্যগঠনে বাক্যগঠনের ভূমিকা অনন্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরে লেখা কৃত্তিবাসের (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ) অনুদিত রামায়ণের অনেক অংশও উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক।

৪.২ রামায়ণের উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক বাক্য ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লেখা হয়েছিল আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আর কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুদিত হচ্ছিল আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। মাঝে একশ বছরের ব্যবধান! উভয় কাব্যের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বাক্য কেমন তা একটু আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। কারণ এতে করে হয়তো কিছুটা হলেও সে যুগের মৌখিক বাক্যগঠনের একটা

সুস্পষ্ট নাহলেও আভাস পাওয়া যেতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণ-রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদটি এরকম —

কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী।।

কেহ্নে যমুনাত তোলসি পাণী।।

বড়ার বহু মো বড়ার ঝী।

আহ্মে পাণি তুলী তোহ্মাত কী।।

কাখের কলস নাম্বাঅ তোহ্মে।

কথা চারি পাঁচ কহিব আহ্মে।।

যার কান্ধে বসে দোসর মাথা।

সেসি আহ্মা সনে কহিব কথা।।

তাম্বুল নেহ আইহনের রাণী।

তোর বচনে জীএ চক্রপাণী।।

তাম্বুল দিআঁ মোরে কি বোলসী।

খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী।।

এহা যমুনাত মো আধিকারী।

আহ্মার বচন সুন সুন্দরী।।

তোর মোর আর বচন নাহীঁ।

বুঝিল তোহ্মার মত কাহ্নঞীঁ।।

সুদ্ধ সুবন্নের মোর কিঙ্কিণী।

এহা নেহ মোর ধরহ বাণী।।

গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী।

মোর কাজ নাহিঁ তোর কিঙ্কিণী।।

(শ্রীকৃকী, যমুনাখণ্ড, ২নং পদ, পৃ. ৯৫)

প্রচলিত বাংলায় এর রূপান্তর অনেকটা এরকম —

কার বউ তুই কাহার রাণী।

কোন যমুনায় তুলিস পাণী।।

বড় ঘরের বৌ বড় ঘরের ঝি।

আমি জল তুলি তোর তাতে কি।।

কাখের কলসী নামাও তুমি।

চার পাঁচ কথা কহিব আমি।।

যার কাঁধে আছে দু-দুটো মাথা।

সে আমার সাথে কইবে কথা।।

তাম্বুল নে রে আয়ানের রাণী।

তোর কথায় বাঁচে চক্রপাণী।।

তাম্বুল দিয়ে মোরে, কি আর বলিস।

বঁড়শির খুদে রুই বাঁধছিস।।

এই যমুনায় আমি অধিকারী।

আমার বচন শোন সুন্দরী।।

তোর আর আমার কোনো কথা নাই।

বুঝলাম তোমার মন হে কানাই।।

বিশুদ্ধ সোনার আমার কিঙ্কিণী।

এই নাও শোন আমার বাণী।।

আমি গোয়ালিনী নই নাচুনি।

কাজ নাই মোর তোর কিঙ্কিণী।।[১]

যমুনায় জল আনতে গিয়ে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হওয়ার পর পরস্পরের মধ্যে বাক্‌চাতুর্যময়

উক্তি-প্রত্যুক্তিটিকে আমরা হাস্যরসের যে পর্যায়েই ফেলি না কেন, এতে বাচিক ও আঙ্গিকের মধ্যে সংলাপ-পরম্পরার যে ক্রমপারম্পর্য লক্ষিত হয় তার সংযত যথার্থতা আমাদের আশ্চর্যান্বিত করে! এরকম উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অজস্র। 'দানখণ্ডে' দেখি বড়াই রাধাকে হারিয়ে খুঁজতে খুঁজতে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন যে কৃষ্ণ তাঁর নাতনীকে দেখেছে কিনা ইত্যাদি। পদটি এরকম —

আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে।

বিনয় করিয়া পুছন্তি দেবরাজে।।

কথাঁ হৈতে আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।

একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে।।

গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী।

আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতনী।।

পাছে পাছে জাইতে পথ হারাইল আহ্মি।

মথুরার পথ পুতা কহিআ দেহ তুহ্মি।।

সঙ্গে কেহ্নে লআঁ বুল নাতিনিখানী।

কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ত্ববাণী।।

কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ।

আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ।।

দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরা নগরী।

বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরী।।

নাতিনী হারাইলোঁ নামে চন্দ্রাবলী।

কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী।।

(শ্রীকৃকী, দানখণ্ড, ১নং পদ, পৃ. ৫)

উপরোক্ত পদটি ছন্দোবন্ধনে লেখা, এর চরণে চরণে অন্ত্যানুপ্রাস আছে কাজেই এটি অবশ্যই পদ্য। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে বুঝতে বাকি থাকে না যে বড়ু চণ্ডীদাস নিতান্তই প্রথাবশত এটি পদ্যে রচনা করেছেন। কারণ এতে দেখা যায় যে এই পদ্যের ওপর গদ্যের চাপ রয়েছে, অর্থাৎ পদ্যকে দিয়ে গদ্যের কাজ করানো হচ্ছে। যে গদ্যের মাধ্যমে আমরা স্বয়ং গল্প বলি, তথ্য পরিবেশন করি, সংবাদ বিনিময় করি — এখানেও সেই একই কাজ করতে হচ্ছে পদ্যকে, সে যুগের সাহিত্যে এরকম হাজার হাজার লাইন আছে। এবার এই প্রসঙ্গানুসারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রায় একশ বছর পর অনুদিত গ্রন্থ কৃত্তিবাসের রামায়ণের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বাক্যগঠনের দিকে নজর দেওয়া যাক — রামায়ণের 'সুন্দরকাণ্ডে' 'সীতাদেবী ও হনুমানের কথোপকথন' অংশে দেখি —

বিভিষণকন্যা সে সানন্দা নাম ধরে।

তার মা পাঠায় তারে আমার গোচরে।।

তার ঠাঁই শুনিলাম এই সারোদ্ধার।

বিনাযুদ্ধে বাছা, মোর নাহিক উদ্ধার।।

সুগ্রীবেরে জানাইও মম বিবরণ.

শ্রীরামেরে জানাইও মোর নিবেদন।।

হনূ বলে, মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ।

তোমা ল'য়ে যাব, যথা শ্রীরাম-লক্ষণ।।

বল মৃগ হই মাতা, বল হই পাখী।

কিসে আরোহিয়া যাবে, বল মা জানকী।।

জানকী বলেন, তুমি বিঘত-প্রমাণ।

মনুষ্যের ভার কি সে স'বে হনূমান।।

* * * *

জানকী বলেন, বাছা, তোমার আকার।

দেখিয়া আমার মনে লাগে চমৎকার।।

কেমনে তোমার পৃষ্ঠে, রব আমি স্থির।

সাগরে পড়িলে খাবে হাঙ্গঁর কুম্ভীর।।

পরপুরুষের স্পর্শে নাহি লয় মন।

কি করিব, বলে ধরি আনিল রাবণ।।

রাবণের মত কি করিবে মোরে চুরি।

তাকে মারি উদ্ধারহ, তবে বাহাদুরি।।[২]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ এই দুই কাব্যের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বাক্যাংশগুলো লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে উভয় কাব্যের পদ্যের উপর গদ্যের একটা চাপ রয়েছেই, তবে একশ বছরের ব্যবধানে যে পার্থক্যগুলো আমাদের চোখে সহজে পড়ে, তা হ'ল বানান পদ্ধিতি ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির তুলনায় কৃত্তিবাস অনেকটা সতর্ক একই শব্দের একাধিক বানান কম দেখা যায়, আর দ্বিতীয় পার্থক্যটি হ'ল যতি চিহ্ন। উক্তি-প্রত্যুক্তিতে পূর্ণ যতি চিহ্নের পাশাপাশি উর্দ্ধকমা, হাইফেন ব্যবহৃত হয়েছে যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনুপস্থিত। বাক্যগঠনে যতি চিহ্ন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চরিত্রসমূহের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বাক্যের মাধ্যমে রসের যে ফল্গুধারা বহমান তা কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনুপস্থিত।

ভাষার বাক্যগঠন পদ্ধতি সঠিকভাবে জানতে হলে বিশ্লেষণ করতে হলে তা পদ্যের মাধ্যমে সম্ভব নয়। কারণ পদ্যে কবি বাক্যগঠন করেন ছন্দোবন্ধে সেখানে বাক্যগঠনে পদের নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করা হয় না। বাক্যগঠনে পদের নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করা হয় গদ্যে। অথচ বাংলা ভাষায় প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে মধ্য যুগ পর্যন্ত পদ্যকেই সাহিত্যিকরা সাহিত্যের বাহন করেছেন। অবশ্য সাহিত্যের টীকা গদ্যেই লেখা হয়েছিল। যেমন — চর্যাপদের সংস্কৃত টীকা গদ্যে। চৈতন্যজীবনী লেখা হল পদ্যে। তার টীকা লেখা হল সংস্কৃত গদ্যে। তার একটা কারণ এও হতে পারে প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে দ্বিভাষিকতার আধিপত্য। যদি তৎকালীন যুগের লেখকরা বাংলা ভাষায় দর্শন, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান ইত্যাদি লেখার তাগিদ অনুভব করতেন তাহলে হয়ত বাংলা ভাষা-সাহিত্যের জগতে বাংলা গদ্যের আবির্ভাব আরো তরান্বিত হত।

৪.৩ অন্ত্য-মধ্য বাংলার যুগসন্ধিক্ষণের কাব্য অন্নদামঙ্গল ঃ

ভারতচন্দ্র (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) যুগসন্ধিক্ষণের কবি। 'যুগসন্ধি' হল — একটি যুগের বিদায় লগ্ন এবং অপর একটি যুগের আবির্ভাব মুহূর্ত। ড০ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মত প্রসিদ্ধ সমালোচক

ভারতচন্দ্রকে সব দিক দিয়ে 'যুগসন্ধি'র কবি বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মাঝখানে ভারতচন্দ্রর আবির্ভাব।[৩] এহেন যুগসন্ধি কবির রচিত 'অন্নদামঙ্গল' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলের গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেখনি তাহার কারুকার্য।"[৪] আর আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন — "ভারতচন্দ্রের কাব্য ভাষার তাজমহল।"[৫]

বলাইবাহুল্য ভারতচন্দ্রর কাব্যে তাঁর বৈদগ্ধ, পাণ্ডিত্য ও রসচেতনা প্রকাশিত হয়েছে. তাঁর রচিত অনেক বাক্য আজ প্রবাদবাক্যের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচনার একমাত্র বিষয় হল বাক্যগঠন। রস, ছন্দ, অলংকার বা প্রবাদবাক্য নয়। এই অধ্যায় আমরা পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে ব্যবহৃত যে কোন দুটি চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বাক্য নিয়ে আলোচনা করেছি, তাই এখানেও আমরা এবার ভারতচন্দ্রর অন্নদামঙ্গলে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বাক্যের মাধ্যমে বাক্যগঠনের রূপ নিয়ে আলোচনা করব। অন্নদামঙ্গলের "হর-গৌড়ীর কথোপকথন" অংশে দেখি —

দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।

এত দিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ি।।

ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আরবার।

সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর।।

হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই।

শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই।।

অর্দ্ধ-অঙ্গ তোমার আমার অর্দ্ধ-অঙ্গে।

হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি রঙ্গে।।

হাঁসিয়া কহেন দেবী এমনো কি হয়।

সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়।।

নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।

পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন।।

পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে।

তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে।।

পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।

অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়।।

অর্দ্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।

কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা।।

শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম।

তোমার সহিত নহে এমন মরম।।

তোমার শরীর আমি মাথায় করিয়া।

দেখিয়াছ ফিরিয়াছি পৃথিবী যুরিয়া।।[৬]

বাংলা সাধুভাষার গদ্যের বাক্যগঠনে ক্রিয়াপদ এক মূখ্য ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ সাধুভাষায় রচিত গদ্য ও চলিতভাষায় চলিত গদ্যের মধ্যে যে পার্থক্য তা প্রধানত ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য পদ্যাংশের বাক্যগঠনে দেখা যায় যে বাক্য অনেকটা সাধু গদ্যের কাছাকাছি এসেছে। আর তা মনে হরার কারণ বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ (সাধু গদ্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ), তাছাড়া অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সাধুভাষাকেই অনুসরণ করেছে। আরো স্পষ্ট করে বলতে হলে এই বলতে হয় যে পরবর্তীকালের সাধু গদ্যের ছাঁদ এখানে অনেকটা স্পষ্ট।

তবে যতি চিহ্নের ক্ষেত্রে আধুনিকতা ছায়া বা গদ্যের ছায়া নেই। প্রশ্নবোধক বাক্য এখানেও পূর্ববৎ প্রশ্নচিহ্ন বিহীন। যেমন — /কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী। শ্রীকৃকী, পৃঃ৯৫/কিসে আরোহিয়া যাবে, বল মা জানকী।। কৃ. রা. পৃ. ২৬৪/,/ সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর।। অন্নদামঙ্গল, পৃ. ২৫/। তবে যতি চিহ্নের ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিছুটা এগিয়ে।

৪.৪ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ভাষা ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ভাষা নিদর্শন হিসেবে এখানে আমরা এই মুহূর্তে কেবল শাক্ত পদাবলী থেকেই উদ্ধৃতি দেবো। শাক্ত পদাবলীগুলো বেশির ভাগ এই শতাব্দীর শেষার্ধই রচিত হয়েছিল। আর এখানে এই শাক্ত পদাবলী থেকে উদাহরণ চয়ন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল সেই

যতি চিহ্ন। যার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি যে বাক্যগঠনে যতি চিহ্ন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছিল পূর্ণ যতি (একটি দাঁড়ি অথবা দুটি দাঁড়ি) ; কৃত্তিবাসী রামায়ণে পূর্ণ যতি, কমা, ঊর্ধ্বকমা এবং হাইফেন আবার অন্নদামঙ্গলে কেবল পূর্ণ যতিই ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু কিছু শাক্ত পদাবলীত এই সকল যতি চিহ্নের পাশাপাশি বাক্যের ভাবানুযায়ী প্রশ্নবোধক চিহ্ন ও ড্যাস ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, রামপ্রসাদ সেনের একটি পদে আছে —

আমি অই খেদে খেদ করি -

ঐ যে মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি।

মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি,

আমি বুঝেছি, পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমারি চাতুরী।।

কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না, সে দোষ কি আমারি?[৭]

এখানে বাক্যগঠনে ব্যবহৃত পদ চলিতভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ। আধুনিক বাংলার অনেকটাই কাছে চলে এসেছে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে পদ্য বচনের কাছাকাছি এসেও যেন কাছাকাছি আসে না। কিছুটা দূরত্বেই থাকে। তাছাড়া কবি তার ইচ্ছে মত বাক্যগঠন করতে পারেন— ভাবের প্রয়োজনে, ছন্দের প্রয়োজনে, অলংকারের প্রয়োজনে, সে স্বাধীনতা একজন কবির সবসময়ই থাকে। অপরদিকে গদ্য ও বচন অনেক বেশি কাছাকাছি গদ্য রচনায় বাক্যগঠনে একটা ক্রম সব ভাষাতেই অনুসরণ করা হয়। কাজেই কোন ভাষার বাক্যগঠন পদ্ধতি জানতে হলে সেই ভাষার বচন (কথ্য ভাষা) এবং লিখিত গদ্য ভাষার বিশ্লেষণ করতে হবে।

মধ্যযুগে বাংলায় কিছু কেজো গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, বাংলা গদ্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন — ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ মল্লদেবের পত্র।[৮] আছে কিছু প্রশ্নোত্তরময় বৈষ্ণব কড়চা যা গদ্য-পদ্যে লিখিত হয়েছিল। এছাড়া আছে দলিল-দস্তাবেজ, ধর্মচর্চা ও বিষয়চর্চা উপলক্ষে লিখিত কিছু গদ্য।

১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে কোচবিহাররাজ নরনারায়ণের লেখা চিঠির অংশবিশেষ এইরকম —

'তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপতি গতায়ত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।'[৯]

বিশ্বভারতীতে সংগৃহীত শত শত চিঠির মধ্যে একটি চিঠি উৎসুক গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা ১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত হয়েছিল। চিঠির অংশ বিশেষ এই রকম —

'জোয়াব মালদহ্ সরকার জর্ন্নাতাবাদ পরগণা মজকুর হামারে তালুক ইসমে তরফ মজকুরমে বসতবাষ ও গুজরানী আপ্তাধি জমী সব্ব মবলগে ২৩ তেইস বিঘা ও আমকা দরখত ১২ বাড়ো পেড় তুমকো ব্রহ্মোত্তর দিয়া গেয়া ময়ফিক তপশীল চিহ্নিত লে করকে আবাদানসে শ্রীশ্রীপাতসাজীওকো আশীষ করকে পূত্রপোত্রীদীসে ভোগ করঙ্গে ইস্কা মালগুজারিসে এলাকা নাহী এতদর্থে ব্রহ্মোর্ত্তর পত্র দিয়া - ইতি সন ১০৬২ এক হাজার বাসট্রী সাল তারিখ ২১ কার্ত্তীক -

শ্রী সবদল খাঁনস্য"[১০]

উদ্ধৃত পত্রটিতে বিশুদ্ধ তৎসম শব্দের পাশাপাশি আরবি- ফারসি-হিন্দি শব্দ বসে গিয়ে বাংলা গদ্যের এ এক আশ্চর্য রূপ দেখতে পাই। এই পত্রটি কোন বাঙালির লেখা পত্র নাও হতে পারে। বাংলা ভাষায় লেখা কোন অবাঙালিরও হতে পারে। কারণ এই সময়ে বাংলা ভাষা বঙ্গে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যেমন, অসমে লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কার কাজ করত। তাই প্রয়োজনে বাংলার বাইরেও এইধরণের কেজো বাংলা গদ্যের চর্চা হতে দেখি। এ প্রসঙ্গে কাছাড়রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট শ্রীনাথ দুয়রা বড়বড়ুয়ার পত্রের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল ঃ "দৈব যাহাকে যেহি করাবে সেহিসে হয়; ইহাতে মনুষ্যের কর্ত্তব্যতা নাই। তথাচ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তাজনক কদাচ ধর্ম্ম ছারে না। আর এই দোষ গ্রহণ কর; তবে পূর্ব্বে ˘ ˘ এ ধর্ম্মক্ষেত্রতে পিত-পুত্র সম্বন্ধ নিবন্ধ রক্ষা হৈল না। ... এরূপ যে দেখিয়াছেন আন্না সেরূপ দোষ গ্রহণ করি নাই। ইতি সন ১৭২৬, তারিখ ১৪ চৈত্র।"[১১]

এরকম চিঠি এবং দলিল-দস্তাবেজ আরো আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল — যেখানে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্থের একজন কবির (বড়ুচণ্ডীদাস) হাতে অনেক সময় বাংলা সাধু গদ্যের ছাঁদ স্পষ্টতই ধরা দিল, সেখানে পরবর্তীকালে (মধ্যযুগে) অন্য কোন বাংলা কাব্যে এমনকি কেজো গদ্যেও গদ্যের এত স্পষ্ট ছাপ দেখা যায় না! যা আমাদের কেবল আশ্চর্যান্বিতই করে না, এক প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই গদ্যের জন্য বাংলা ভাষাকে বিভিন্ন কারণে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল!

৪.৫ তবে মনে রাখতে হবে উদ্ধৃত অংশ দুটিই মধ্যযুগের বাংলা বাক্যগঠনের নিদর্শন হিসেবে শেষ কথা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রচিত হয়েছিল দোম আন্তনিও দো রোজারিয়ো রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ (রচনাকালঃ ১৭৩৪) ও পাদরি মানোয়েল-দা আস্‌সুম্পসাম্ রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৪৩ খ্রি.)। বাংলা গদ্যে বিদেশি লেখকের হস্তাবলের জন্য। বিদেশি বাক্যরীতির প্রভাব নিতান্ত অসুলভ নয়। আমরা জানি যে বাক্যগঠনে পদের ক্রম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন— চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (এমনকি সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত পত্রগুলতেও) ইত্যাদি গ্রন্থে ক্রিয়ার নঞর্থক অব্যয় 'না' বেশিরভাগ সময় ক্রিয়ার পূর্বেই

বসেছে। বর্তমানে বাংলার ভগিনী স্থানীয়া ভাষা অসমিয়া ও উড়িয়ায় ক্রিয়ার নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার আগে বসলেও বাংলায় ক্রিয়ার পরে বসে। এ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ড০ সুধাংশুশেখর তুঙ্গ। তিনি বিজ্ঞান সম্মতভাবে এই সম্পর্কে একটি তথ্য তুলে ধরেছেন। সেটি হল — "অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ দশকে রচিত দুখানি বাংলা গদ্য গ্রন্থ পাই। এ দুটি হল 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' ও 'ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ'। ভাল করে হিসাব করে দেখা গেছে 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থে 'না' ক্রিয়ার পূর্বে বসেছে ৬০% বার ও পরে বসেছে ৪০%। 'ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ' গ্রন্থে অনুপাত দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫০% ও ৫০%। ঊনবিংশ শতকের শুরুতে (১৮০১খ্রি.) প্রকাশিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র গ্রন্থে দেখি যে 'না' প্রায় সর্বত্রই ক্রিয়ার পরে বসেছে, দু একবার মাত্র আগে বসেছে। এর পরে মুদ্রিত আর কোন গদ্য গ্রন্থে 'না'-কে ক্রিয়ার আগে বসতে দেখা যায় নি। এভাবে অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় যে ঘটনার সূচনা হয়েছিল তার পূর্ণ ও পরিণত ফল পাওয়া গেল একশ বছর পরে, ঊনবিংশ শতকের শুরুতে।"[১২]

৪.৬ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত হল হালহেডের 'A Grammar of the Bengal Language'— প্রথম বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ। এর দুবছর পর ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে জেমস অগাস্টাস হিকী তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' মুদ্রণের জন্য কলকাতায় সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করলেন। ১৭৭৮ থেকে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আরো অনেক বিদেশি বিদগ্ধ পণ্ডিতরা বাংলা গদ্যে লেখালেখি শুরু করলেন যার বেশির ভাগ ব্যাকরণ ও অনুবাদ গ্রন্থ। কেমন ছিল তাঁদের অনুবাদ উদাহরণ নিয়ে দেখা যেতে পারে —

১. এডমনস্টোনের অনুবাদ (১৭৯১) —

"সকল ফেরবার লোককে রক্ষা করা হাকিমের কর্ত্তব্ব কর্ম্ম বিশেষত তাহাদিগে জাহারা সহজেই দুস্থ পেয়ার তালুকদারান ও রায়ত লোক ও আর খেত আবাদ করুণ ওালা দিগের ভালর নিমিথ্যে ও রক্ষা করিবার নিমিথ্যে নবার গবর্ণর জানরেল বাহাদুর জখন মানছেন বুঝেন আইন করিবেন।" [বেঙ্গলি ট্রানশ্লেসন অফ রেগুলেশন্স ফর দি অ্যাডমিনিসট্রেশন অফ জাসটিস ইন্ দি ফৌজদারি অর্ ক্রিমিনাল কোর্ট- বঙ্গানুবাদ]"

২. ফরস্টারের অনুবাদ (১৭৯৩) —

"হাকীমের উচিত জে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতঃ দুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেণ অতয়েব ঐ শ্রীযুত সকল মফস্বলী তালুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাসী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করণ উচিত জানেন সেকালে তাই নির্দিষ্ট

করেণ কিন্তু এমনত সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইবাতে কোন প্রকারে জমীদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যাধিকারীদিগের শিরে যে মোকবরী জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহার দিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না। ['কর্ণওয়ালিশ কোড'- এর বঙ্গানুবাদ]"[১৩]

উদ্ধৃত বাক্য দুটির গদ্য-নিদর্শনের রচনাকাল ১৭৯১ ও ১৭৯৩। এডমনষ্টনের গদ্যভাষা ফারসীবহুল ও আড়ষ্ট। পক্ষান্তরে ফরস্টারের গদ্যভাষা অপেক্ষাকৃত সরল। আমরা জানি, ফারসীবহুলতা সেকালের বাংলা গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য — তা হালহেড ও ফোর্ট উইলিয়াম গোষ্ঠীর অনেক লেখকের রচনায় অনায়াসলক্ষণীয়। তবে গদ্যের আসল পরীক্ষা বাক্যের সংগঠনে — পদান্বয় কৌশলে, বাক্যাংশগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায়। এই পরীক্ষায় এডমনস্টোন ও ফরস্টার কেউই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হননি। তবে উদ্ধৃত দুটি গদ্য-নিদর্শনে বিরামচিহ্নের প্রয়োগবিরলতা সহজেই চোখে পড়ে। তবে গদ্যাংশ পাঠে কোন অসুবিধা হয় না। বাক্যাংশগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধবোধেও কোন অনিশ্চয়তা নেই। অবশ্যস্বীকার্য, সমগ্র বাক্যের দৈর্ঘ্য ও ভারসাম্য নিরূপণে সুমিতির অভাব আছে। আর বিদেশির হাতে রচিত বলে তাদের নিজস্ব ভাষার স্টাইল ও স্থানীয় কথ্য ভাষার শব্দ, উচ্চারণ অনুযায়ী বানান ও বিভক্তির প্রয়োগ দুর্লক্ষ্য নয়।

তথ্যসূত্র

১. জানা. নরেশচন্দ্র (সম্পা.) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন; বন্দোপাধ্যায়. দেবনাথ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে হাস্যরস, পৃ. ২৪২-২৪৩

২. মজুমদার. সুবোধচন্দ্র (সম্পা.), কৃত্তিবাস-রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ, পৃ. ২৬৪-২৬৫

৩. কামিল্যা. মিহির চৌধরী (সম্পা.), ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৩৪

৪. ঐ, পৃ. ২৬

৫. ঐ, পৃ. ২৬

৬. ঐ, পৃ. ২৬

৭. মুখেপাধ্যায়. ধ্রুবকুমার (সম্পা.), শাক্ত পদাবলী, পৃ. ২৪৩-২৪৪

৮. মুখোপাধ্যায়. অরুণকুমার, বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, পৃ. ৫০

৯. বসু. ত্রিপুরা, দুশো বছরের বাংলা নথিপত্র, পৃ. ১৫

১০. ঐ, পৃ. ১২-১৩

১১. তুঙ্গ. সুধাংশুশেখর, বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা ঃ ষোড়শ-অষ্টাদশ শতক, পৃ. ১৭৮-১৭৯

১২. ঐ, পৃ. ৭৩

১৩. মুখোপাধ্যায়. অরুণকুমার, বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, পৃ.৫২

পঞ্চম অধ্যায়

৫. আধুনিক বাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি

৫.১ ঐতিহাসিক দিকে থেকে দেখতে গেলে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত বাংলা ভাষার অন্ত্য-মধ্যযুগ ধরা হয়। দেখা যায় এই পর্যন্ত যত সাহিত্য রচিত হয়েছে তা দেব প্রভাবমূলক এবং তার বাহন পদ্য।

ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত দলিল-দস্তাবেজের গদ্য-ভাষা এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনুদিত বাংলা গদ্য-ভাষার আলোচনা ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে। আর এতে দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আধুনিকতা তথা নাগরিকতার পূর্বাভাসের ঢেউ বাংলা গদ্যে আসতে শুরু করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই পূর্বাভাস ধীরে ধীরে স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হতে থাকে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তা খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। তাই আলোচনার সুবিধার জন্য আধুনিক বাংলা গদ্যের বাক্যগঠনের আলোচনা আমরা দুই পর্বে বিন্যস্ত করে আলোচনা করব — প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ আর দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর বাংলা বাক্যগঠনের পদ্ধতি।

৫.২ প্রথম পর্ব ঃ

হালহেড তাঁর A Grammar of the Bengal Language গ্রন্থের Syntax অধ্যায়ে অত্যন্ত বিরসভাবে বলেছেন যে, অধিকাংশ বাঙালিই বাংলাভাষার বানান ও ব্যাকরণে এত ভুলভ্রান্তি করে যে, মনে হয়, তারা নিজেদের ভাষাও ভালোভাবে বলতে কইতে পারে না। ফলে এ ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ অকারণে অনুপ্রবেশ করেছে, তারা (বাঙালিরা) নাকি একটা বাক্য গঠনও করতে পারে না, শব্দরূপও বলতে পারে না।[১] এবার দেখা যাক উক্তিটির যথার্থতা কতখানি। অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্য কেজো গদ্য। তার সঙ্গে অপর কোন ভাষার সাহিত্যিক গদ্যের তুলনা চলে না। তুলনা করতে হলে আমাদের সচেতনভাবে গড়ে তোলা কোন Serious গদ্য বা সাহিত্যিক গদ্যের সঙ্গে তুলনা করতে হবে।

আধুনিকতার যে পূর্বাভাস অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেখা দিচ্ছিল তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতীয়মান হতে থাকে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে এই কলেজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল এক লেখকগোষ্ঠী। এই লেখকগোষ্ঠীতে দেশি-বিদেশি পণ্ডিত ছিলেন, যাঁরা বাংলা গদ্যের চর্চা

করতেন (তবে অনেক সময়ই প্রয়োজনের তাগিদে)। এই একই সময় এই গোষ্ঠীর বাইরের কিছু উচ্চশিক্ষিত বাঙালি যুবক বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চায় ও উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করল। আকস্মিক ও আশ্চর্য পরিবর্তন এল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে। ইংরেজি ভাষার মারফতে বাঙালি সর্বপ্রথম সমগ্র ইউরোপের ক্লাসিক, রোমান্টিক ও আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ পেল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের জীবনবাদী প্রেরণা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির চেতনায় নব-প্রবাহ আনল।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার-ই ছিলেন যথার্থ গদ্যশিল্পী। কোন রীতিটি বাংলা গদ্যের আদর্শ রীতি তা নিয়ে তিনি ভাষাতাত্ত্বিকদের মতোই নানা রীতির পরীক্ষা করেছেন। এখানে তাঁর রচনা থেকে একটি সাধুভাষার ও একটি সহজ সরল ভাষার উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

১. সাধুভাষার দৃষ্টান্ত — এইরূপে রাজা ভর্ত্তৃহরি বন প্রবেশ করিলে পর মালুয়াদেশ অত্যন্ত অরাজক হইল, উজ্জয়িনীর রাজধানী শ্মশান প্রায় হইল। ইহাতে অগ্নিবেতাল নামে এক বেতাল ঐ দেশকে আক্রমণ করিয়া প্রজালোকদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে পাত্র-মন্ত্রি প্রভৃতিরা অতি উদ্বিগ্ন হইয়া ঐ অগ্নিবেতালকে তুষ্ট করিয়া তাহার সহিত এক নিয়ম করিলেন। সে নিয়ম এই ঃ প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক পুরুষ রাজা হইয়া সমস্ত দিন কাজকর্ম করে, রাত্রি হইলে অগ্নিবেতাল তাহাকে ভক্ষণ করে। — রাজাবলি (১৮০৮)

২. সরল ভাষার দৃষ্টান্ত — ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, 'তবে কি আজি খাওয়া হবে না, ক্ষুধায় মরিব' তৎপত্নী কহিল, 'মরুক ম্যানে, আজি কি পিঠা না খাইলেই নয়? দেখা-দেখি হাঁড়িকুড়ি খুদকুড়া যদি কিছু থাকে।' ইহা কহিয়া ঘর হইতে খুদকুড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল, 'শীলটা ভাল বটে, লোড়াটা যা ইচ্ছা তা। এতে কি চিকন বাটা হয়? মরুক যেমন হউক, বাটি ত।' — প্রবোধচন্দ্রিকা (রচনাকাল আনুমানিক - ১৮১৩)[২]

সাহিত্যের ইতিহাসকার বলেছেন, 'এ ভাষাই পরবর্তী বাংলা গদ্যের জননীস্থানীয় তা স্বীকার করতে হবে।'[৩]

এবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠীর বাইরের কোন একজন গদ্যশিল্পীর গদ্যে বাক্যগঠনের মাধ্যমে তাঁর গদ্যশৈলীর আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে রামমোহনের গদ্যরচনা থেকে দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাক ঃ

১. ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ হয়েন এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ হয়েন যেহেতু বেদে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এক জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্ঞান হয় আর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে মৃৎপিণ্ড

জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার জ্ঞান হয় এ দৃষ্টান্ত তবে সিদ্ধ হয় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয় আর ব্রহ্ম ঈক্ষণের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এমত বেদে কহেন অতএব এই শ্রুতি সকলের অনুরোধে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ হয়েন।

(বেদান্তসার — ১৮১৫)

২. কি আশ্চর্য শাস্ত্রের অন্যথা করিবার কুমত রক্ষার নিমিত্ত তাবৎ বিধবাকে ধর্মত্যাগিনী কহিতে প্রবর্ত হইলেন, স্ত্রীবধরূপ অতিপাতকে প্রবর্ত হইলে এইরূপ প্রবৃত্তিই ঘটিয়া থাকে। (সহমরণ বিষয়, ১৮২৯)[৪]

এখানে বর্ণনাভঙ্গী প্রথম চৌধুরীর ভাষায় 'জলবত্তরল' হয়েছে, তা নয়। তবে তর্কের খাতিরে লিখিত দ্বিতীয়টির ভাষার মধ্যে যৌক্তিক গ্রন্থনা আছে। আর প্রথমটির ভাষা শাস্ত্রানুবাদের ভাষা তাই শাস্ত্রানুবাদের ভাষা আর বিবাদ-বিতর্কের ভাষার মধ্যে পার্থক্যতো থাকবেই, আর একটি বাক্য ঃ

"সংসারের সুখে আসক্ত হইয়া যে ব্যক্তি কহে, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হই, সে কর্ম ও ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট হয়। এই যে বশিষ্টের বচন লিখিয়াছেন, এ যথার্থ বটে, যে হেতু সংসারের সুখে আসক্ত হউক, অথবা না হউক, যেকোন ব্যক্তি এমত অভিমান করে যে আমি ব্রহ্মজ্ঞ, অথবা অন্য কোন প্রকারে গুরুত্বাভিমান করে সে অতি অধম।

('প্রবর্তক ও নিবর্তর্কের, সম্বাদ', ১৮২৯)[৫]

এখানে বক্তব্য বিষয় পরিচ্ছন্ন, বাক্যবিন্যাস ও অন্বয়ের উৎপত্তি অনেকটা স্বাভাবিক। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, তাঁর " ..... তাঁর ভাষা কটমটে নয়, আর তাঁর গদ্য ইংরেজীর অনুকরণ নয়, সংস্কৃতেরও, কিন্তু খাঁটি বাংলা। .... সংস্কৃতের অনুকরণে যে বাংলা গদ্য লেখা অসম্ভব, সে জ্ঞান তাঁর ছিল। ... বাংলা একটি স্বতন্ত্র ভাষা, ও তার বাক্য গঠন প্রণালীও যে বিভিন্ন, এ বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথম বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।"[৬] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সে যুগের লেখক-পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষার গদ্যশৈলী ও তার বাক্যপ্রকারণ নিয়ে যথেষ্ট অনুশীলন করতেন এবং এটাও প্রমাণিত যে প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষিত বাঙালির শিক্ষাসত্তা দ্বিভাষিক স্তরে উন্নীত ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে বহুভাষিক। তাই হালহেড তাঁর A Grammar of the Bengal Language (1778) গ্রন্থের Syntax অধ্যায়ে যে মন্তব্য করেছেন বাঙালিরা একটা বাক্যগঠনও করতে পারে না, শব্দরূপও বলতে পারে না, তা সর্বৈব ভুল ব্যাখ্যা। তাঁর উন্নাসিকতা!

৫.৩ এবার আসা যাক ঊনবিংশ শতাব্দীর আরেক দিক্‌পাল সাহিত্য-শিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর গদ্যরীতির আলোচনায়, আমরা জানি যে সংস্কৃত গদ্যরীতির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় ছিল

নিবিড়। তবু তিনি সংস্কৃত গদ্যরীতির অন্ধ অনুসরণ করেননি। তা করা সম্ভবও নয়। সংস্কৃত বাক্যগঠনে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ বা পদের নির্দিষ্ট কোন ক্রম অনুসরণ করা হয় না। কিন্তু বাংলায় তা সম্ভব নয়। যাইহোক বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গদ্যরীতির আদর্শ পরিহার করে দীর্ঘ সমাসবহুল বাক্যকে ক্ষুদ্রতর বাক্যে বিভক্ত করলেন, পদগুলির মধ্যে স্থাপন করলেন ধ্বনিসামঞ্জস্য, ছেদচিহ্ন প্রয়োগ করে অর্থসম্পন্ন বাক্যাংশ সৃষ্টি করলেন, ক্রিয়ারূপে ও শব্দে সরলতা আনলেন, অনুচ্ছেদ রচনা করে অর্থমণ্ডল সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বাক্যগঠনের জন্য যে সকল উপাদান দরকার তার প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন প্রয়াসে ব্রতী হলেন। ম্যাথু আর্নল্ড কথিত গদ্যের আদর্শ তাঁর লক্ষ্য — "The needful qualities for a fit prose are regularity, uniformity, precision and balance."[৭] গদ্যের বাক্যগঠনের অন্বিষ্ট হল ঋজুতা, ভারসাম্য, যাথার্থ্য ও শৃঙ্খল; বিদ্যাসাগরও এই বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়।

অনেকেই বিদ্যাসাগরকেই বাংলা গদ্যের প্রথম সচেতন সাহিত্য-শিল্পী বলে মনে করেন। কারণ তিনিই বাংলা সাধু গদ্যের কাঠামো কী হওয়া উচিত তা স্থির করেন এবং চলিত গদ্যের সম্ভাবনা কতটা আছে তা নিয়ে পরীক্ষা করেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অতিশয় পেলব ও মার্জিত, শুদ্ধ ও সংযত রসনৈপুণ্যের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় মনোবৃত্তিমূলক যুক্তিনিষ্ঠা ও পরিণামবোধ, স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতা — এই দুইয়ের মিলন ঘটেছে বিদ্যাসাগরী গদ্যশৈলীতে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর লেখা পুস্তক বেশিরভাগই ছিল ফরমায়েসি পাঠ্যপুস্তক, তাই অনেকক্ষেত্রেই সেই রচনা প্রাণহীন আড়ষ্ট গদ্যরচনা। বাক্যে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শব্দ চয়নে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। তিনি বাংলা গদ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তা করেছিলেন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, বাংলা গদ্যভাষায় একটি বাক্য কয়েকটি বাক্যাংশের সমষ্টি মাত্র, আবার এই বাক্যাংশগুলি শ্বাস-পর্ব ও সার্থ-পর্বে বিভক্ত। এইভাবে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সুষম, সাবলীল, শৃঙ্খলাবদ্ধ সাহিত্য-গদ্যে পরিণত করে তোলেন। এ নিয়ে তিনি যে অনেক ভেবেছিলেন, তার প্রমাণ, তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির সংস্করণসমূহ। প্রতি গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণসমূহে বিরাম চিহ্নের উত্তরোত্তর বহুল প্রয়োগ, সম্বোধনপদের পরিবর্তন, ক্রিয়ারূপের সরলতা ও পদান্বয়ের সংস্কার সাধনের প্রয়াস তিনি করেছিলেন। তিনি বাক্যের অন্তর্গত বাক্যাংশগুলোর সংখ্যা হ্রাস করেন। সুদীর্ঘ সমাসের ব্যবহার কমিয়ে ফেলেন, শ্বাস-পর্বানুসারে বাক্যাংশ ব্যবহার করেন, বাক্যাংশগুলোর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও অর্থ সাপেক্ষরূপে ব্যবহার করেন, প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহারে তদ্ভব ক্রিয়াপদ ও গদ্যের সাবলীলতা বজায় রাখার জন্য সুললিত তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন, আর বাক্যগঠনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি তিনি সচেতনভাবে করেছিলেন তাহল অর্থানুসারে কমা, ড্যাস, সেমিকলন প্রভৃতি বিরামচিহ্ন প্রয়োগ করেছিলেন। গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেছেন —

"বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ... বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন — ... বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটি ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলির নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা - উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"[৮]

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির ক্রমবিবর্তন ও বৈচিত্র্যের পরিচায়ক হিসেবে তিনটি উদাহরণ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ-

১. "উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্বসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে, নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সর্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন ; তথাপি, রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহারপূর্বক, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন!"[৯] (বেতালপঞ্চবিংশতি, ১৮৪৭)

এখানে বাক্য হ্রস্ব ও সরল, তৎসম শব্দ ও ক্রিয়াপদের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

২. "কিয়ৎক্ষণ পরে শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং শকুন্তলার শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া, কহিলেন, বাছা! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল ; এখন অনেক ভাল আছি! তখন গৌতমী, কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া, শকুন্তলার সর্ব্ব শরীরে সেচন করিয়া কহিলেন, বাছা! সুস্থ শরীরে চিরজীবনী হয়ে থাক। অনন্তর, লতামণ্ডপে, অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা, কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া, কহিলেন,

এই অসুখ, তুমি একলা আছ বাছা, কেউ কাছে নাই! শকুন্তলা কহিলেন, না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল ; এই মাত্র, মালিনীতে জল আনতে গেল। তখন গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর রোদ নাই, অপরাহ্ন হয়েছে, এস কুটিরে যাই।"[১০] (শকুন্তলা, ১৮৫৪)

বাক্যগঠনে আধুনিকতা লক্ষণীয়। উপযুক্ত স্থানে যতি স্থাপনের ফলে বাক্যগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এছাড়া এখানে সম্বোধনে ও প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহারে তদ্ভব শব্দে ও সরল ক্রিয়াপদের ব্যবহার যার মধ্যে এখন কয়েকটি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে যা চলতি বাংলা গদ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন — /হয়েছিল/, /হয়েছে /; অসমাপিকা ক্রিয়া / হয়ে / ইত্যাদি। উক্তি দুই প্রকার প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি। এখানে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ উক্তিগুলো সরল বাক্যে রচিত।

৩. "সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্য প্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হয়েছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন।

রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিনী- তীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বাণপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, এই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন।

লক্ষণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবনগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরণমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায়, অলঙ্কৃত, আধিত্যকাপ্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদসমূহে আচ্ছন্ন থাকতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।"[১১]

(সীতার বনবাস, ১৮৬০)

আলোচ্য অংশের ধ্বনিলালিত্য ও শব্দঝংকার আমাদের মুগ্ধ করে। মানব মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম তার ভাষা, তাই ভাব বা বিষয়ানুযায়ী শব্দ প্রয়োগ করলে তা ভাবের উপযুক্ত বাহন হয়। এই অংশে বিদ্যাসাগর দেখিয়ে দিলেন যে ভাব অনুযায়ী শব্দ চয়ন করলে তা পাঠক বা শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করতে বাধ্য। প্রয়োজনে তৎসম কিংবা সমাসবদ্ধ পদও ভার না হয়ে ভাবের উপযুক্ত বাহন হতে পারে। তাই তার গদ্য স্টাইলের প্রধান উপাদান ভাব ভাষাপ্রকৃতির অনুকূল সংস্কৃত শব্দ আর তার বাক্যগঠনরীতি অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি গদ্যের অনুযায়ী। ম্যাথু আর্নল্ড কথিত needfull

qualities, regularity, uniformity, precision and balance সবেই আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে অন্ত্য-মধ্য যুগের বাংলা বাক্যগঠনের আলোচনায় আমরা ড০ সুধাংশুশেখর তুঙ্গ -এর উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছি যে কখন থেকে কিভাবে পাশ্চাত্য অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার বাক্যগঠনের প্রভাবে বাংলা বাক্যগঠনে ক্রিয়ার নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পরে বসতে শুরু করল। তার পরে বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা ভাষার বাক্যগঠনে আরো কয়েকটি পালক জরো হল! এটাই বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি। বাংলা তথা যে কোন ভাষার বাক্যগঠনে বিরামচিহ্ন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যাসাগর এই বিরামচিহ্নের সচেতন ও সুষ্ঠ প্রয়োগ করেছেন। এর আগে রামমোহন এবং আরো অনেকের গদ্যে তথা বাক্যগঠনে বিরামচিহ্নের এরূপ সুষ্ঠ প্রয়োগ দেখি না। বিরামচিহ্নের মাধ্যমে তিনি বাক্য ও বাক্যাংশের মধ্যে এক সুশৃঙ্খলা এনেছেন। যা পরবর্তীকালে (এখন পর্যন্ত) অনুসরণ করা হচ্ছে।

৫.৪ বাংলা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতার সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে, পূর্ববর্তী অর্ধে যার প্রস্তুতি ও প্রয়াস, দ্বিতীয়ার্ধে তার পূর্ণ বিকাশ। ইতিহাসকারেরা যার নাম দিয়েছেন আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের প্রভাবে এক নবজাগরণ দেখা দিল। যা তদানীন্তন সাহিত্যে বিশেষত গদ্য সাহিত্যে প্রতিফলিত হল। এইসময় বাঙালি বাংলায় দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ এবং পুস্তক লেখার তাগিদ অনুভব করল; সেই সঙ্গে একে একে প্রকাশিত হতে থাকল বাংলা সংবাদপত্র, গদ্যসাহিত্যের নব নব ধারা — উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণ কাহিনি, প্রবন্ধ ইত্যাদি। এই সময়ের বিখ্যাত লেখকরা হলেন — ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সংস্কৃত কলেজের লেখকগোষ্ঠীর প্রধান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যের ছাঁদ বেঁধে দিয়েছিলেন। এদিকে হিন্দু কলেজের লেখকগোষ্ঠীর প্রধান প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা চলিত ভাষার আদলে বাংলা গদ্যে এক অভিনব সরল ভঙ্গির প্রবর্তন করলেন। শুরু হল সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার দ্বন্দ্ব। রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় প্রকাশিত 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) এই ব্যপারে অভিনবত্ব দেখাল। কথ্যভাষার রীতিতে বাক্যরচনা, প্রচুর তদ্ভব এবং চলিত ফারসি শব্দের ব্যবহার এবং ক্রিয়াপদে তৎসম ও চলিত পদের মিশ্রণ - এটাই হচ্ছে মাসিক পত্রিকার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে ছাপা থাকত —

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হউক।"[১২]

এইপ্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রাকৃত নাটকে মহিলাদের মুখে মাগধী ও পুরুষের মুখে শৌরসেনী বা সংস্কৃত ভাষা দেওয়া হত, মাগধী সেসময় সকলেরই (পূর্বোত্তরে) মুখের ভাষা, তা সত্ত্বেও সাহিত্যে

পুরুষের মুখে বিশেষত শিক্ষিত বা সম্ভ্রান্ত পুরুষের মুখে কথ্যভাষা মাগধীর প্রয়োগ করা হত না। তারমানে তখনও ছিল দ্বিভাষিকতার উন্নাসিকতা!

প্যারীচাঁদ মিত্র টেঁকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্মনামে ১৮৫২ সালে প্রকাশ করলেন 'আলালের ঘরে দুলাল'। এই বইয়ের ভাষাকে অনেকে বলেন আলালী ভাষা। তবে আলালের ঘরে দুলালের ভাষার প্রধান গুণ হচ্ছে এর ভাষা — যা সর্বসাধারণের বোধগম্য সরস ভাষা। সাধুভাষার যুক্ত ক্রিয়াপদের পরিবর্তে চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার, তদ্ভব ও দেশি শব্দের প্রচুর প্রয়োগ, সমাসযুক্ত পদের পরিবর্জন, কথ্যভাষায় ব্যবহৃত ফারসি শব্দের এবং কথ্যভাষাসুলভ বাক্যাংশ এবং প্রবাদবাক্যের প্রয়োগ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —

> "তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, — তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা করিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না।"[১৩]

এখানে প্যারীচাঁদের ভাষারীতির একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল —

> " ... চাকরকে বলছেন, ওরে হরে! শীঘ্র বালি যাইতে হইবে, দুইচার পয়সায় একখানা চলতি পানসি ভাড়া কর তো। বড় মানুষের খানসামারা মধ্যে বে-আদব হয়। হরে বলিল, মোসায়ের যেমন কাণ্ড, ভাত খেয়ে বস্তেছিনু - ডাকা-ডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেছি।"[১৪] (আলালের ঘরে দুলাল)

৫.৫ প্যারীচাঁদ মিত্রের পর এলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর প্রসিদ্ধ গদ্যরচনা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'। যে কালীপ্রসন্ন গদ্য রচনায় আগাগোড়া ক্লাসিক সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন, তিনিও আবার হুতোম প্যাঁচার নকশায় একেবারে চলিত বুলি, এমন কি উচ্চারণত্রুটি সুদ্ধ ব্যবহার করেছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে —

> 'রাস্তার লোক জমে গ্যালো - সিংগি বাবু অবাক্-ব্যাপারখানা কি? তখন এক জন অধ্যক্ষ বল্লেন, 'মহাশয়! আমাদের অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পূজোয় মা ভগবতী সিংগির উপর চড়ে কৈলাশ থেকে আস্‌ছিলেন, পথে সিংগির পা ভেঙ্গে গ্যাছে; সুতরাং তিনি আর আস্‌তে পার্চ্চেন না। সেই খানেই রয়েচেন ; আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন, যে যদি আর কোন সিংগির যোগার কত্তে পার, তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি, কোথাও আর সিংগির দেখা পেলাম না ; আজ ভাগ্যক্রমে আপনার

দেখা পেয়েছি, কোন মতে ছেড়ে দোবো না- চলুন! যাতে মার আসা হয়, তাই তদ্‌বির করবেন।" সিংগি বাবু অধ্যক্ষর কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কল্লেন।"[১৫]

'হুতোম প্যাঁচার নকশা' একেবারে কথ্যভাষার ছাঁদে লেখা। কলকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষার ছাঁদ স্পষ্ট। সাধুভাষার অযথা মিশ্রণ নেই। পরবর্তীকালের চলতি বাংলার পূর্বাভাস এই হুতোমেই পাওয়া যায়। বীরবল অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী তার 'সবুজপত্র'-এ এই চলতি ভাষাই ব্যবহার করেছেন, তবে কলকাতার 'ককনি' বুলি নয়। বাক্যগঠন বিষয়ে সাধুভাষা ও চলতি ভাষা কোনটা পাঠক-শ্রোতার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে বিস্তর টানাপোড়েন চলছিল এই পুরো ঊনবিংশ শতাব্দী জুরে।

৫.৬ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে যেমন রবীন্দ্রযুগ বলা হয়, ঠিক তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশককে বঙ্কিমযুগ বলা হয়। তাই বঙ্কিমের গদ্যরীতির আলোচনা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোচনা অসম্পূর্ণ।

সুকুমার সেন বঙ্কিমের উপন্যাসগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন —

১. সংস্কৃতঘেঁষা ঃ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী

২. প্রাকৃতঘেঁষা ঃ বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, যুগলাঙ্গুরী

৩. নিজস্বরীতি ঃ ইন্দিরা, রজনী, রাধারাণী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম। সেইসঙ্গে 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-কেও এই পর্যায়ে ফেলেছেন।[১৬]

সংস্কৃতঘেঁষা অর্থে যেখানে বা যে রীতিতে তৎসম শব্দ ও সমাসযুক্ত পদের বাহুল্য এবং পদপ্রয়োগ পদ্ধতি সংস্কৃতের ধরণে। আর যে রচনা পদ্ধতিতে তৎসম ও সমাসযুক্ত পদের ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা কম তা-ই প্রাকৃত ঘেঁষা। যে রচনাপদ্ধতিতে বঙ্কিম তৎসম ও তদ্ভবকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন এবং যার বাক্যরচনা-রীতি সম্পূর্ণভাবে কথ্যভাষার আদর্শানুযায়ী, এক কথায় এটাই বঙ্কিমের নিজস্ব রীতি। সংস্কৃতঘেঁষা বাক্যরীতির উদাহরণ হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা' থেকে উদাহরণ দেওয়া হল —

১. গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদি বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমনীমূর্ত্তি।

কেশভার — অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার ; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না — তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।[১৭]

২. সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী ; রমণী সুন্দরী ; ধ্বনিও সুন্দর ; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।[১৮]

৩. অন্যদিকে, অনেক দূরে নৌকাভরনা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছিল।[১৯]

৪. কপালকুণ্ডলা শুনিয়া চমকিতা হইলেন।[২০]

সংস্কৃতব্য বাক্যরীতি এখানে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েছে। সমাসযুক্ত পদের বাহুল্য। আর একটি কথা এখানে না বললেই নয়, তা হল— স্ত্রীলিঙ্গ পদের বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়েছে, যেমন — সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী, রমণী সুন্দরী, নৌকাভরণা ভাগীরথী ইত্যাদি। এমনকি স্ত্রী-লিঙ্গের ক্রিয়াবিশেষণেও স্ত্রী-প্রত্যয় প্রযুক্ত করেছেন। যেমন - চমকিতা হইলেন। এরকম উদাহরণ অজস্র। প্রাচীন বাংলায় বিশেষ্য স্ত্রী-লিঙ্গ হলে তার বিশেষণও স্ত্রী-প্রত্যয় গ্রহণ করত। যেমন - হাড়েরী মালী, বুড়িলী মাতঙ্গী ইত্যাদি। সংস্কৃতেও বিশেষ্য স্ত্রী-লিঙ্গ হলে তার বিশেষণ স্ত্রী-প্রত্যয় গ্রহণ করত। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল 'কপালকুণ্ডলা'ই নয় অন্যান্য অনেক রচনায় এরকম ব্যবহার করেছেন। আর এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল; তা হল, সংস্কৃত রীতিতে পদ গঠন করে বাক্য রচনা এরপরও চলছিল। অনেক শিক্ষিত বাঙালির অভিরুচি এটাই ছিল।

এবার বঙ্কিমের নিজস্বরীতি নিয়ে একটু আলোচনা করব। আর এক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করার আগে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতে চাই।

১. রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "যুদ্ধকালে সকলেই চোর — সকলেই বঞ্চক। আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি — চোরের মত লুকাইয়া আছি। তুমি যে প্রকারে পার, এ সকল সংগ্রহ করিও।"[২১] (রাজসিংহ)

২. গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল, "এ কালো! রোহিনী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে, এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব। আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।[২২] (কৃষ্ণকান্তের উইল)

৩. রাধারাণীর মাতা দুর্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন, "যতদিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অন্ততঃ ততদিন আপনারা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান করুন, আমি আপনাকে মাতার মত রাখিব।"[২৩] (রাধারাণী)

৪. পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয় — তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ — দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর — আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর - ছি! ছি![২৪] (বিড়াল, কমলাকান্তের দপ্তর)

দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা বিদ্যাসাগরী পদ্ধতিতে রচিত হয়েছিল। কিন্তু উপরোক্ত চারটি উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট এটাই বঙ্কিমী রচনারীতি। ভাষা পরিবর্তনশীল তাই বলে এটা মনে করা ভুল যে ভাষা যে কোন একজনের হাতেই চরম রূপ পাবে বা অল্প সময়ের ব্যবধানে কোন ভাষার অর্থাৎ তার রচনারীতি তথা বাক্যগঠন আমূল বদলে যাবে। ভাষা ধীরে ধীরে অল্পবিস্তর বদলালেও ভাষায় বাক্যের কাঠামো অনেকদিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। যেমন, সরলবাক্য বা যৌগিকবাক্যে ব্যবহৃত পদের ক্রম আগেও যা ছিল এখনও তা আছে। পদগঠনে, শব্দে ধ্বনি সংস্থাপনে, বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য পদের সম্পর্ক সূচক চিহ্ন বিভক্তির পরিবর্তন হয়েছে, প্রত্যয়ের ক্ষয়-বৃদ্ধি-লয় ইত্যাদি হয়েছে। এই পরিবর্তনও বাক্যগঠনে প্রভাব ফেলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'নিজস্ব রচনা-পদ্ধতি'র বিশেষত্ব হল —

১. বাক্যগুলো অধিকাংশই সহজ এবং সরল (Simple Sentence)

২. নিশ্চয়াত্মক বাক্যের (affermative sentence) স্থানে প্রশ্নবোধক বাক্যের (interrogative sentence) ব্যবহার।

৩. বাক্য মধ্যে সংযোজক অসমাপিকা ক্রিয়ার (Conjunctive) স্থানে সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার।

৪. একই বাক্যের অথবা একই কর্তৃপদ কিংবা ক্রিয়াপদ সম্বলিত বাক্যের পুনরাবৃত্তি। যা তার রচনায় এনেছে সরসতা।

৫. বঙ্কিমের পূর্ববর্তী লেখকরা তাঁদের লেখায় কথকের স্থান নিতেন। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর লেখায় এমনভাবে উপস্থিত যে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছেন। যেমন — 'কমলাকান্তের দপ্তর'। এটাই বঙ্কিমী স্টাইল।

[illegible]

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
এমন শক্তিমান!
তুমি কি এমন শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান
তোমাদের এমনি অভিমান!
চিরদিন [redacted] টানবে [redacted] পিছে [redacted]
চিরদিন রাখবে [redacted] নীচে,
এত [redacted] বল [redacted] নাইরে তোমার
[redacted] সবে না সেই টান।
বাঁধনে
[redacted] যতই ঘোরো
আছে [redacted] বল দুর্বলেরো,
[redacted] হওনা যতই বড়
[redacted] আছেন ভগবান
আমাদের শক্তি মেরে
তোরাও বাঁচবি নে রে,
[redacted] !
[redacted]
বোঝা তোর ভারী হলেই
ডুববে তরীখান!

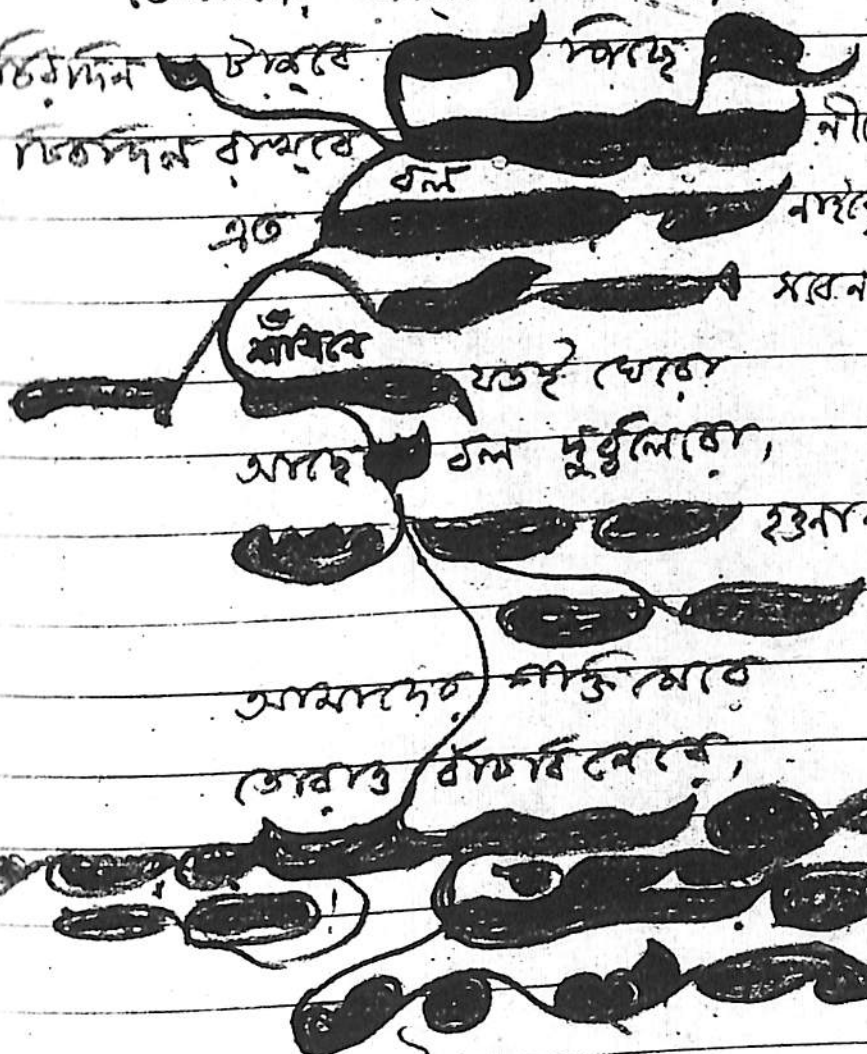

[illegible]
[illegible] আশ্বিন
১৩১২

৬. সাধুভাষায় বাক্যরচনা করলেও মাঝে মাঝে কথ্য ভাষার 'ক্রিয়াপদ'ও দু-একটা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন — করুন, হল, এলেম ইত্যাদি।

৫.৭ দ্বিতীয় পর্ব ঃ

আধুনিক বাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতির এই পর্বে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর গদ্যপ্রকৃতির বাক্যভঙ্গি আলোচনা করব। আর এই পর্যায়ে বিশেষ আলোচনার দাবি রাখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা এতদূর বড়িয়ে দিয়েছেন যা যে কোন ভাষায় কোন একজন লেখক দাবি করতে পারেন না। আজ থেকে হাজার বছর আগে বাংলা ভাষার পথ চলা শুরু হয়েছে। প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা এবং আধুনিক বাংলা ভাষা — সময়ের পরিবর্তনের নিরিখে তার এই পর্ব বিভাগ। বিভিন্ন পর্বে ভাষাকে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘষামাজা। কৃত্রিম সাধুভাষা না চলতিভাষা কোনটি হবে বাংলা লেখ্য ভাষার মাধ্যম। কিন্তু মনে রাখতে হবে সাধু ভাষাকে যতই কৃত্রিম ভাষা বলি না কে তা-ও কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে কথ্যভাষার উপর ভর করে। যেমন বাংলা সাধু ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের পুরুষ ও কালসূচক প্রত্যয় /—ছিলাম / —ইতেছি /—ইতেছ / — ইতেছিলে / ইত্যাদি বাংলা পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রভাবজাত ! যেমন — পূর্ববঙ্গে, আমি কাজটা করত্যাছিলাম> সাধুভাষায়, আমি কাজটি করিতেছিলাম ; এই পরিবর্তন ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রথমদিকে সাধুভাষায় গদ্য রচনা করেছিলেন। পরে বিশেষত 'সবুজপত্রে'র যুগ থেকে চলতিভাষায় লিখতে শুরু করেন। অবশ্য এর আগে 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' -ও তিনি চলতিভাষায় লিখেছিলেন।

সাধুভাষা ও চলতিভাষার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন —

> "বাংলাভাষাকে চিনতে হবে ভালো করে; কোথায় তার শক্তি কোথায় তার দুর্বলতা, দুইই আমাদের জানা চাই।
>
> রূপকথায় বলে, এক-যে ছিল রাজা, তার দুই ছিল রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলাবাক্যধীপেরও আছে দুই রানী - একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা; আর একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধু ভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষায় আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। ... রূপকথায় শুনেছি সুয়োরানী ঠাই দেয় দুয়োরানীকে গোয়ালঘরে। কিন্তু

গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরানী যায় নির্বাসনে, টিকে থাকে একলা দুয়োরানী রানীর পদে। বাংলায় চলতি ভাষা বহুকাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকোনো আমিনার পাশে যেখানে সন্ধেবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসী তলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোরবেলাতে। গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।"[২৫]

বাংলা গদ্যের স্টাইল বা রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যৎবাণী বা বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যাইহোক এবার আসা যাক রবীন্দ্রনাথের গদ্যে বাক্যগঠনের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতিতে শব্দালঙ্কারের চাইতে অর্থালঙ্কারের প্রতি অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার মধ্যে উৎপ্রেক্ষা, উপমা, রূপক, শ্লেষ ও বিরোধ এই কয়টির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। এবার একে একে উদাহরণের আশ্রয়ে বিচার করে দেখা যেতে পারে। যেমন, উৎপ্রেক্ষা —

১. শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ পরীক্ষার স্থির হইয়া ছিল।[২৬]

২. মনটা সহসা একটা বোঝা হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।[২৭]

আবার, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকের মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে এক অপরূপ মাধুর্য ও দীপ্তিমণ্ডিত করেছেন। ইংরেজি থেকে নেওয়া অলঙ্কারবস্তুও রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতায় অপরূপভাবে রূপান্তরিত হয়েছি। যেমন —

১. লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা, আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত বুঝিতে পারিল।[২৮]

২. আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে, আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববসন্তের চলন্ত প্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।[২৯]

কোন কোন বাক্যে শব্দ বিশেষ ভাবের দ্যোতক হয়ে এক অপূর্ব অলঙ্কার সৃষ্টি করেছে। যেমন —

১. সে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরের মত শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।[৩০]

২. যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যাথা প্রকাশ করিতে লাগিল।[৩১]

৩. রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক একটি মাণিক্যের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে, ...[১৩২]

আমরা জানি যে বিশুদ্ধ বাক্যের তিনটি লক্ষণ —

ক. আকাঙ্ক্ষা খ. যোগ্যতা গ. আসক্তি

যোগ্যতা ঃ ভাব অনুযায়ী অর্থবোধ বিষয়ে পদসমূহের পরস্পরের মধ্যে অর্থাৎ পরস্পরের সম্বন্ধে বাধা না থাকাকে যোগ্যতা বলে। যেনে — ছেলেরা উড়ছে। বাঘেরা ঘাস খাচ্ছে। পাখিগুলো দৌড়াচ্ছে ইত্যাদি। এখানে ছেলেদের উড়বার যোগ্যতা নেই, বাঘেরা ঘাস খায় না, পাখিরা দৌড়ায় না তারা উড়ে, তাদের দৌড়াবার যোগ্যতা নেই। সুতরাং এগুলো বাক্য হয়নি।

তবে হ্যাঁ এগুলোও বাক্য হতে পারে যদি লেখক প্রতিভাবলে অলঙ্কার বিশেষ রূপে ব্যবহৃত করেন তবে। আলোচ্য উদ্ধৃতিগুলো লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই যে — দ্বিপ্রহর, মর্মব্যথা এবং মাণিক্য এই শব্দ বা পদ তিনটি বাক্যে বিশেষ অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তাই এগুলোর দ্বারা রচিত হয়েছে এক একটি অপূর্ব বাক্য। যেমন — 'দ্বিপ্রহর'-এর কোন সঙ্গী থাকে না কিন্তু 'মত' এই তুলনাবাচক অব্যয়টি ব্যবহার করে 'দ্বিপ্রহর'-কে এক সচল জীব তথা মনুষ্যের পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছেন। এরকম কালজয়ী বাক্য রবীন্দ্র গদ্যরীতিতে অজস্র।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বাক্যরচনা বিষয়ে আলোচনা করলে যে বিষয়টি আমাদের প্রথমেই চোখে পড়ে তাহল — তিনি সরল বাক্যের ব্যবহার বেশি করেছেন। দীর্ঘ বাক্য-পরম্পরার শুরুতে বা শেষে হ্রস্ব বাক্য ব্যবহার করেছেন। যেমন —

"অমিত রায় ব্যারিষ্টার। ইংরাজি ছাঁদে রায় পদবী 'রয়' ও 'রে' রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে, কিন্তু সংখ্যা হল বৃদ্ধি। এই কারণে নামের অসামান্যতা কামনা করে অমিত এখন একটি বানান বানালে যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল — অমিট্ রায়ে।"[১৩৩]

অর্থসঙ্গতি ক্রমে অসম্পৃক্ত ঘটনার বৈপরীত্য সংযোজক অব্যয় ছাড়াই স্বল্প-আয়োজনে যৌগিকবাক্য রচনা করে ভাষা তথা বাক্যগঠনে বৈচিত্র্য এনেছেন। যেমন —

"সেইদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যাতারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল — বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।"[১৩৪]

আবার কখনো-কখনো সরলবাক্য দিয়ে শুরু করে যৌগিকবাক্যের দিকে অগ্রসর হয়েছেন,

আবার চলতে চলতে সরল বাক্যে ফিরছেন। যেমন —

"আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা। ডানদিকে জঙ্গল ঢাকা খাদ। এ রাস্তার শেষ লক্ষ্য অমিতের বাসা। যেখানে যাত্রী-সম্ভাবনা নেই, তাই সে আওয়াজ না করে অসতর্কভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়টা ভাবছিল, আধুনিক কালে দূরবর্তিনী প্রেয়সীর জন্যে মোটর-দূতটাই প্রশস্ততার মধ্যে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' বেশ ঠিক পরিমানেই আছে — আর, চালকের হাতে একখানি চিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক করে নিলে আগামী বৎসরে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মেঘদূতবর্ণিতা রাস্তা দিয়েই মোটরে করে যাত্রা করবে, হয়তো বা অদৃষ্ট ওর পথ চেয়ে 'দেহলীদত্তপুষ্পা' যে পথিকবধূকে এতকাল বসিয়ে রেখেছে সেই অবন্তিকা হোক বা মালবিকাই হোক, বা হিমালয়ের কোন দেবদারুনচারিণীই হোক, ওকে হয়তো কোনো একটা অভাবনীয় উপলক্ষে দেখা দিতেও পারে। এমন সময় হঠাৎ বাঁকের মুখে এসেই দেখলে আর একটা গাড়ী উপরে উঠে আসছে। পাশ কাটাবার জায়গা নেই।"[৩৫]
(শেষের কবিতা/২)

আলোচ্য উদ্ধৃতিতে আরো একটি লক্ষ্যণীয় বিশেষত্ব হল, ক্রিয়াহীন বাক্যরচনা — / আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা /, কিংবা আগের উদ্ধৃতিতে আছে / অমিত রায় ব্যারিস্টার / , এরকম ক্রিয়াহীন সম্পূর্ণ সরল বাক্য বাংলা ভাষার অপর এক বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। যেমন, চর্যাপদ আছে — কায়া তরুবর পঞ্চবি ভাল ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে — কোটর বাটুল দুই আঁখি, বড়ার বহু আন্ধি বড়ার ঝি ইত্যাদি। এখানে ক্রিয়া উহ্য। কিন্তু ইংরেজিতে ক্রিয়াহীন Sentence অসম্পূর্ণ। যাইহোক এখন প্রশ্ন হল বাংলায় সরলবাক্য কাকে বলে? সহজ কথায় — যে বাক্যে একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাই সরলবাক্য। তাহলে এখানে / অমিত রায় ব্যারিস্টার / বা / আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা / এই বাক্য দুটি কি সরলবাক্য নয়? আমরা বলব এ দুটিও সরলবাক্য। বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এখানে ক্রিয়া সশরীরে নেই, উহ্য। কিন্তু ভাবে আছে তাই এ দুটিও সরলবাক্য (Simple Sentence)। / আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা / এই লাইনের পরের লাইন দুটি যৌগিকবাক্য। যৌগিকবাক্য হল পরস্পর-নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক বাক্য কোন সহযোগী বা সংযোজক অব্যয় বা কোন বিশেষ বিরাম চিহ্ন দ্বারা সংযুক্ত হয়ে যে পূর্ণবাক্য গঠিত হয় তাই যৌগিকবাক্য (Compound sentece)। বিশেষ বিরাম চিহ্নের দ্বার সৃষ্ট যৌগিকবাক্যের উদাহরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। আর জটিলবাক্য (Complex sentence) হল যেখানে একটি প্রধানবাক্যের সঙ্গে অন্য অপ্রধান বাক্য কোন অনুগামী, কোন সমুচ্চায়ী অব্যয় বা কোন সাপেক্ষ সর্বনাম দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি পূর্ণবাক্য গঠিত হলে তাকে জটিলবাক্য বলে। যেমন — তুমি যা ভেবেছে তাই হয়েছে।

আমরা জানি বাংলা বাক্যে পদ সজ্জা বা বাক্যে পদ সংস্থাপনের গুরুত্ব অনেক। সংস্কৃতের মত নয় যে বাক্য মধ্যে পদ যেকোন স্থানে বসতে পারবে। ইংরেজিতে সাধারণভাবে বাক্যে পদ স্থান হল — কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম। আর বাংলায় হল — কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া। তবে এর অন্যথা হলে যে বাক্য হবে না তা নয়। তবে সাধারণত বাক্যগঠনে পদক্রম অনুসরণ করা হয়, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। এই পদক্রমের বাইরে অন্য পদক্রমগুলো হল কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম, ক্রিয়া-কর্ম-কর্তা, কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া এবং কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা।

কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এটাই বাংলা বাক্যগঠনের বহুল প্রচলিত পদক্রম। রবীন্দ্রনাথও তার প্রথমদিনের গদ্যরচনায় এই ক্রম অনুসরণ করলেও পরে বাংলা বাক্যগঠনে এর ব্যতিক্রম বা ক্রমবিপর্যয় ঘটালেন। আর এরই মাধ্যমে বৈচিত্র্য আনলেন বাংলা কাব্যগঠনে। যেখন —

কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম ঃ অমিতের বাপ ছিলেন দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার।[৩৬]

কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা ঃ অমিতকে আমি পছন্দ করি।[৩৭]

ক্রিয়া-কর্ম-কর্তা ঃ ভাবছিলুম এতক্ষণে রেলগাড়ি না জানি কোথায় গিয়ে পৌঁছাল।[৩৮] (ছিন্নপত্র, ৬৫ নং পত্র)

এভাবে তিনি বাক্যের অবয়ব গঠনে এক বৈচিত্র্য এনেছিলেন অতি অনায়াসেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে শব্দনির্মাণ, বাক্যগঠন, পদবিন্যাস অলঙ্কার ব্যবহারে 'শেষের কবিতা' এক উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী।

আবার চলে আসি রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষা এবং চলিতভাষার আলোচনায়। তিনি 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে বলেছিলেন, "…. দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।" তাই করে গেলেন। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর শেষপর্যন্ত চলিতভাষাকেই তাঁর গদ্যের প্রকাশমাধ্যম করলেন। তাঁর 'গোরা' সাধুভাষায় লেখা হলেও এমন সরস যে কথ্যভাষার উপর ভিত্তি করে রচিত। অপরদিকে 'ঘরে-বাইরে' চলিতভাষায় লিখিত হলেও ভাব ও ভাষার গাম্ভীর্যের জন্য হঠাৎ করে তা সাধুভাষা বলে মনে হয়। এও একধরণের পরীক্ষা, যা দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে উভয় ভাষারীতি দিয়েই সরস ভাব গম্ভীর বিষয় আলোচনা করা যায়। সাহিত্যে কথ্যভাষা কেবল মহিলা বা অশিক্ষিত পুরুষের মুখের ভাষা নয়। চলিতভাষার চলবার শক্তি আছে। তিনি বলেছেন, "চলিত ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলাবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না।"[৩৯]

৫.৮ রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে চলিতভাষার বিরাম নেই! সত্যিই তারই হাত ধরে বিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হলেন একঝাঁক তরুণ লেখক। প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, তারপর বিংশ শতাব্দীতে

বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ। এখানে আমরা কেবল মুজতবা আলীর গদ্য বা বাক্যগঠন নিয়েই আলোচনা করব। এখানে একটি কথা জেনে রাখা ভাল যে মুজতবা আলীর রবীন্দ্রানুগত্য প্রশ্নাতীত হলেও তাঁর গদ্য কখনোই অন্ধ রবীন্দ্রানুসরণ করেনি। মুজতবা আলী হাসি-ঠাট্টা-মশকরা-আড্ডা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যের বিষয়সমূহ উপস্থাপিত করেছেন। যাকে বলে মজলিশি ঢং। বহুভাষাবিদ্ মুজতবা আলীর বাক্যে বিভিন্ন ভাষার (দেশি ও বিদেশি) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলা চলিতগদ্য যে কত ধাবৎশক্তিসম্পন্ন হতে পারে তা মুজতবা আলীর রচনা না পড়লে বোঝা যায় না। প্রমথনাথ বিশীর মতে মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'দেশে-বিদেশে'। এই 'দেশে-বিদেশে' থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে দেখা দিতে পারে।

> "মনে পড়ল, কলুটোলা জাকারিয়া স্ট্রীটে হোটেলের গাড়ী-বারান্দার বেঞ্চে বসে কাবুলীরা শহর রাঙা করেন বটে। আরো মনে পড়ল, দক্ষিণভারতে বর্মা মালয়ে এমন কি খাসিয়া পাহাড়েও প্রচুর পান খাওয়া হয় — যদিও এদের কেউই কাশী-লক্ষ্ণৌয়ের মত তরিবৎ করে জিনিসটার রস উপভোগ করতে জানে না। তবে 'সুপারি'? উঁহু কথাটো তো সংস্কৃত নয়। লক্ষ্ণৌয়ে বলে 'ডলি' অথবা 'ছালিয়া' - সেগুলোও তো সংস্কৃত থেকে আসেনি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে 'গুয়া' কথাটার 'গুবাক' না 'গূবাক' কি একটা সংস্কৃত রূপ আছে না? কিন্তু তাহলেও তো কোন কিছুর সমাধান হয় না, কারণ পাঞ্জাব দোয়াব এসব উন্নাসিক আর্যভূমি ত্যাগ করে খাঁটি গুবাক হঠাৎ পূর্ববঙ্গে গিয়ে গাছের ডগায় আশ্রয় নেবেন কেন? আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানদের সব মাঙ্গলিকেই সুপারির প্রয়োজন হয়। কিন্তু গৃহ্যসূত্রের ফিরিস্তিতে গুবাক — গুবাক? নাঃ। মনে তো পড়ে না। তবে কি এ নিতান্তই অনার্যজন-সুলভ সামগ্রী? পূর্বপ্রাচ্য থেকে উজিয়ে উজিয়ে পেশওয়ার অবধি পৌঁচেছে? সাধে বলি, ভারতবর্ষ তাবৎ প্রাচ্যসভ্যতার মিলনভূমি।"[৪০]

এখানে দেখি, ছোট-বড় বিভিন্ন বাক্যের সমাবেশ। সব 'কর্তা', দিয়ে শুরু হয়নি। কোন বাক্য 'অব্যয়' যেমন — 'তবে', কিন্তু' ইত্যাদি। আবার কোন বাক্য বহুত্ববাচক শব্দ 'আরো' দিয়ে শুরু হয়েছে। আবার এত ছোট বাক্য আছে যা একটি শব্দেই সমাপ্ত হয়েছে। যেমন - 'নাঃ'। প্রশ্নবোধক বাক্য তো আছেই নিশ্চয়াত্মক বাক্যও আছে। যেমন — "লক্ষ্ণৌয়ে বলে 'ডলি' অথবা 'ছালিয়া' - সেগুলোও তো সংস্কৃত থেকে আসেনি।" বা "মনে তো পড়ে না" ইত্যাদি বাক্যগুলো।

বলা যেতে পারে, মজলিশি পরিবেশে বৈঠকি ঢঙে লেখক এমন একটি ভাষা মাধ্যম তৈরি করেছেন যা অনায়াসে পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে যায়। এখানে ব্যবহৃত চলতি ভাষা কথোপকথনের ঢঙে বা বৈঠকে গল্প বলার ঢঙে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

লেখ্যভাষা সে সাধুই হোক কিংবা চলিতই হোক তার সঙ্গে কথ্যভাষার সম্পর্ক থাকবেই কারণ কথ্যভাষার উপর ভিত্তি করেই লেখ্যভাষা তৈরি হয়। তবে হ্যাঁ লেখার সময় অনেক সময় কৃত্রিমতা এসে পড়ে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ কথা যখন বলা হয় তখন তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা হয়, কিন্তু তা যখন লেখা হয় তখন ভেবে চিন্তে লেখা হয় — মনের মধ্যে তখন অনেক কথা অনেক ভাবনা একসঙ্গে এসে জড়ো হয়। তাই লেখ্য চলিত ভাষাও যে সবসময় হুবহু মুখের ভাষার প্রতিচ্ছবি তা নাও হতে পারে। তার উপর বিষয়ানুসারে লেখ্যভাষার মাধ্যম, শব্দচয়ন (পারিভাষিক শব্দ) অন্যরকম হতে পারে। হওয়াই স্বাভাবিক। লেখ্য চলিতভাষার মত সাধুভাষাও কথ্যভাষার উপরই দাঁড়িয়ে আছে। তবে হ্যাঁ, তার কৃত্রিমতা অনেক বেশি তাই সে আড়ষ্ট। এবার আলোচনা করে দেখা যাক বাংলা গদ্যের শুরু যে সাধুভাষা দিয়ে হয়েছিল সময়ের সুদীর্ঘ ব্যবধানে বর্তমানের চলিতভাষার সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়।

এই আলোচনায় একটি মজার কথা এখানে একটু সেরে নেই, তা হল — ইংরেজি, সংস্কৃত, হিন্দি, উড়িয়া, অসমিয়া কোন ভাষার গদ্যরীতিতে এমন দুটি শাখা নেই, অর্থাৎ সাধুভাষা ও চলিতভাষা, এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম বাংলা ভাষা।

সাধুভাষা হল সংস্কৃত পদান্বয় সমৃদ্ধ, তৎসমশব্দবহুল ও মধ্যযুগীয় বাংলার ক্রিয়া-বিভক্তি-অনুসর্গ সমন্বিত ধীর, গুরুগম্ভীর লেখ্যভাষাই সাধুভাষা। এই ভাষায় লিখেছেন - রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীগণ।

রাঢ় অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে আশ্রয় করে তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় তৎসম, তদ্ভব, দেশি, কিছু পরিমাণে বিদেশি শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যে প্রাণবন্ত, গতিময় ভাষার জন্ম হয়, যা শিক্ষিত বাঙালির কথ্যভাষার খুবই কাছের, তা -ই আজ সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন ও সংস্কৃতিচর্চার বাহন। এই রীতিতে লেখা হয়েছে - উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন', বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'র কিছু কিছু অংশ, কালীপ্রসন্ন সিংহের আলালের ঘরে দুলাল', ১৯১৪ -এ সবুজপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথও প্রকাশ্যে বাংলা চলিতভাষা ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন।

বাংলা সাধুভাষা ও চলিতভাষার মূল ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যগুলো হল ঃ-

১. সাধুভাষায় সর্বনামের বিস্তৃতরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন - তাহাদের, যাহাদের, তাহাদিগের, আমাদিগের, তোমাদিগের, যাহা, তাহা, যাহার, তাহার ইত্যাদি। কিন্তু চলিতভাষায় সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন — তাদের, যাদের, ওদের, আমাদের, তোমাদের, যা, তা, এটা, ওটা, যার, তার ইত্যাদি।

২. সাধুভাষায় সর্বনামের মত ক্রিয়াপদেরও বিস্তৃত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন — করিতেছি, করিতেছ, করিতেছিলাম, করিয়াছিলে ইত্যাদি। কিন্তু চলতি ভাষায় ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন — করছি, করছ, করেছ, করেছিলাম, করেছিলে ইত্যাদি।

৩. সাধুভাষায় তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের ব্যবহার বেশি। চলিতভাষায় তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি-বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি।

৪. সাধুভাষায় সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার বেশি। চলিতভাষায় তার ব্যবহার অত্যন্ত কম। তবে ছোট ছোট সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন — চৌমাথা, তেমাথা, সিংহাসন ইত্যাদি।

৫. যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধুভাষায় ব্যাপক। যেমন — গমন করা, শয়ন করা, উপবেশন করা ইত্যাদি। চলিতভাষায় এর ব্যবহার কম।

৬. সাধুভাষায় বিভক্তির বদলে অনেক সময় অনুসর্গ ব্যবহৃত হত। যেমন — সহিত, সমভিব্যহারে, নিমিত্ত, অপেক্ষা ইত্যাদি। চলিত ভাষায় এগুলোর রূপান্তরিত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন — সঙ্গে, জন্য, চেয়ে ইত্যাদি।

৭. সাধুভাষায় বাক্যগঠনে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এই ক্রম সচরাচর লঙঘন করা হত না। কিন্তু চলিতভাষায় এই ক্রমের লঙঘন আকছার হয়ে থাকে, যার উদাহরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি।

৮. সাধুভাষার বাক্য ধীরগতি, কিন্তু চলিতভাষার বাক্য ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'চলিত ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না।'[৪১] উক্তিটি যথার্থ।

বাক্যগঠনে পদেরর ক্রম, অনুসর্গ ইত্যাদির যেমন গুরুত্ব আছে। ঠিক তেমনি গুরুত্ব আছে বিরাম-চিহ্নেরও। প্রাচীন বাংলায় এক দাঁড়ি '।' এবং দুই দাঁড়ি '।।' ব্যবহৃত হত। মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ কমার ',' ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। সঠিক বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করছি ঃ

ক. তুমি এসো, না এলে আমি যাব না।

খ. তুমি এসো না, এলে আমি যাব না।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটিতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে বিরাম-চিহ্নের স্থান পরিবর্তনে বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

বর্তমান বাংলাভাষায় ব্যবহৃত বেশির ভাগ বিরাম-চিহ্ন আমরা ইংরেজি থেকে গ্রহণ করেছি। বর্তমান বাংলায় ব্যবহৃত বিরাম চিহ্নগুলো হল —

এক দাঁড়ি (।) — পূর্ণ বিরতি। বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়।

দুই দাঁড়ি (।।) — পদ্যের দ্বিতীয় পংক্তির শেষে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে।

কমা (,) — সবথেকে অল্প বিরতি সূচনা করে।

সেমিকলন (;) — কমার থেকে কিছু দীর্ঘ বিরতি বোঝায়।

কোলন (ঃ) — প্রায় সেমিকলনের যত, তবে এটা সাধারণত পূর্ববর্তী উক্তির বিশদ বিবরণে ব্যবহৃত হয়।

ড্যাশ (—) — উদাহরণ প্রয়োগ বা একই কথার নানাভাবে বিশদীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

হাইফেন (-) — সাধারণত সমাসবদ্ধ পদে ব্যবহৃত হয়।

বিস্ময়সূচক (!) — বিস্ময়, আনন্দ, শোক, ভয় ইত্যাদি ভাবপ্রকাশে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) - প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় বাক্যের শেষে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

উদ্ধৃতি চিহ্ন (‘ ’/“ ”) - অন্যের বাক্য বা বিশেষ শব্দের উদ্ধৃতিতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

বন্ধনী (())/[ ]) — বাক্যের অন্তর্গত সামান্য অসম্বন্ধ বা বিকল্প অংশ বা শব্দ কখনো-কখনো বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিরাম-চিহ্ন যোগে বাক্যের উদাহরণ দেওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন কারণ এই অধ্যায়ের বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে তার বহুল ব্যবহার আছে। বিদ্যাসাগর থেকে মুজতবা আলী সকলের উদ্ধৃতিতেই এর কম বেশি প্রয়োগ আমরা লক্ষ করি। তবে রামমোহনের বাক্যে বিরাম-চিহ্নর অপ্রতুলতা চোখে পড়ার মত। বিদ্যাসাগরই প্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার করেছেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল — ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হল পদ্যের মোড়ক থেকে বেরিয়ে এসে গদ্যকে নির্দিষ্ট একটি form -এ সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠিত সাধুভাষার মোড়ক থেকে বেরিয়ে চলিতভাষাকে সাহিত্যিক মর্যাদা দেবার আকুতি। যে আকুতি এই চলিতভাষাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে সেই ধারা আজও অব্যাহত। তাই এই অধ্যায়ে আমরা বাংলা সাধুভাষা ও চলিতভাষার

আলোচনা করেছি, তাদের মিল-অমিল, সামঞ্জস্য-পার্থক্য, তাদের গতি, তাদের গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি এই সময়ে সচেতনভাবে ব্যবহৃত বিরাম-চিহ্নেরও যা বাক্যগঠনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

তথ্যসূত্র

১. অকুব, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (পঞ্চম খণ্ড) পৃ. ২৪৬

২. অকুব, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, পৃ.২৯০

৩. ঐ, পৃ.২৯০

৪. অকুব, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ষষ্ঠ খণ্ড) পৃ. ২২৭-২২৮

৫. ঐ, পৃ.২২৮

৬. ঐ, পৃ.২২৯

৭. মুখোপাধ্যায়. অরুণকুমার, বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, পৃ.৯৩

৮. ঐ, পৃ.৯৫

৯. বিদ্যাসাগর. ঈশ্বরচন্দ্র, বেতালপঞ্চবিংশতি, পৃ.১

১০. বিদ্যাসাগর. ঈশ্বরচন্দ্র, শকুন্তলা, পৃ.৩৬

১১. বিদ্যাসাগর. ঈশ্বরচন্দ্র, সীতার বনবাস, পৃ. ৭

১২. সেন. সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ.৬৩

১৩. অকুব, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃ.৩২৪

১৪. ঐ, পৃ.৩২৪

১৫. সিংহ. কলীপ্রসন্ন, সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা (অরুণ নাগ সম্পাদিত), পৃ.৭১-৭২

১৬. সেন. সুকুমার, বাংলা সাহিত্যে গদ্য, পৃ.১০৯

১৭. চট্টোপাধ্যায়. বঙ্কিমচন্দ্র, কপালকুণ্ডলা, পৃ.১২

১৮. ঐ, পৃ.১৩

১৯. ঐ, পৃ.৩৮

২০. ঐ, পৃ.৮৩

২১. চট্টোপাধ্যায়. বঙ্কিমচন্দ্র, রাজসিংহ, পৃ.৫৯

২২. চট্টোপাধ্যায়. বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকান্তের উইল, পৃ.৬৬

২৩. চট্টোপাধ্যায়. বঙ্কিমচন্দ্র, রাধারাণী, পৃ.১১

২৪. চট্টোপাধ্যায়. বঙ্কিমচন্দ্র, বিড়াল, কমলাকান্তের দপ্তর, পৃ.৫৩

২৫. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, বাংলা-ভাষা পরিচয়, রর (ত্রয়োদশ খণ্ড) পৃ.৫৮৩

২৬. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, ক্ষুধিত পাষাণ, গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ.৩২৬

২৭. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, একরাত্রি, গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড), পৃ.৭৪

২৮. ঐ, পৃ.৭৫

২৯. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, পৃ.১১৫

৩০. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, সুভা, গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড) পৃ.১২১

৩১. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, পোস্টমাস্টার, গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড), পৃ.১৯

৩২. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র (৫২ নং পত্র), পৃ.১১৮

৩৩. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, শেষের কবিতা, পৃ.১

৩৪. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, বোষ্টমী, গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড), ৫৬২

৩৫. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, শেষের কবিতা, পৃ.৩০

৩৬. ঐ, পৃ.১৭

৩৭. ঐ, পৃ.৮

৩৮. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র (৬৫ নং পত্র), পৃ.১৪০

৩৯. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, বাংলা-ভাষা পরিচয়, রর (একাদশ খণ্ড), পৃ.৫৮৩

৪০. আলী. সৈয়দ মুজতবা, দেশে-বিদেশে, পৃ.৬৩-৬৪

৪১. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, বাংলা-ভাষা পরিচয়, রর (ত্রয়োদশ খণ্ড), পৃ.৫৮৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬. বাংলা ও তার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত অপরাপর ভাষাগুলোর বাক্যগঠন পদ্ধতি সম্পর্কে তুলনামূলক অধ্যয়ন

৬.১ এ কথা সর্বজনবিদিত যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য তার থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য, মধ্য ভারতীয় আর্য থেকে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোর উৎপত্তি। ঐতিহ্যগত সূত্রেই এই নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোর মধ্যে কিছু সাধারণ মিল বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ, প্রত্যেকটি ভাষাই একই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তবে সময়ের সুদীর্ঘ ব্যবধানে এদের মধ্যে পার্থক্যও বর্তমান। আবার একই ভাষা সময়ের ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন— বাংলা ভাষা, প্রাচীন বাংলার থেকে মধ্য বাংলায় আসতে আসতে ভাষা কিছুটা নতুন রূপ নিয়েছে। আবার মধ্য বাংলা থেকে আধুনিক বাংলায় আসতে অসতে একই ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, পরিবর্তনের সঙ্গেঁ সঙ্গে বাক্যপ্রকারণেও পরিবর্তন হয়েছে। যা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখিয়েছি।

৬.২ প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ সংস্কৃতে বাক্যপ্রকরণে পদের কোন নির্দিষ্ট ক্রম ছিল না। বাক্যে ব্যবহৃত এক একটি পদ এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে পদ বাক্যের যে স্থানেই বসুক না কেন তার অর্থ একই থাকে। যেমন—

ক) সংস্কৃত— রামঃ খাদতি।

খাদতি রামঃ।

এই দুটা লাইনের বাংলা অনুবাদ একই/রাম খায়/।

খ) সংস্কৃত— বয়ং দেশং রক্ষাম।

দেশং বয়ং রক্ষাম।

রক্ষাম দেশং বয়ম্।

বাংলা অনুবাদ— আমরা দেশ রক্ষা করি।

গ) সংস্কৃত— অস্তি দাক্ষিণাত্যে জনপদে মহিলারোপ্যম্ নাম নগরম্।

দাক্ষিণাত্যে জনপদে মহিলারোপ্যম্ নাম নগরং অস্তি ।

বঙ্গানুবাদ— দাক্ষিণাত্যে মহিলারোপ্য নামে এক নগর ছিল।

কাজেই দেখা যায় যে সংস্কৃত বাক্যে পদ ক্রমের নির্দিষ্ট কোন ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নয়। পদগুলোতে সঠিক ভাবগত, কালগত, পুরুষবাচক প্রত্যয়াদি প্রয়োগ করাটা জরুরি।

৬.৩ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় পৌঁছতেই তার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তনতো হলই, সেই সঙ্গে বাক্যপ্রকারণেও পরিবর্তন দেখা দিল। বাক্যপ্রকরণে পদ-স্থানের গুরুত্ব বেড়ে গেল। বাক্যে পদের নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করা হল। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' থেকে দুটি উদাহরণ দিচ্ছি—

শৌরসেনী প্রাকৃত ঃ

রক্ষিণৌ ঃ (পুরুষং তাড়ায়িত্বা) হণ্ডে কুম্ভীলআ, কধেহি কহিং তুএ এশে মহালদণভাশুলে উক্কিণ্ণামক্খলে লাঅকীএ অঙ্গুলীআএ শমাশাদিদে।

বঙ্গানুবাদ ঃ

রক্ষিদ্বয় ঃ ওরে চোর, বল্ কোথায় তুই এই মহারত্নসমুজ্জ্বল রাজকীয় নামাক্ষর ক্ষোদিত আঙটি পাইয়াছিস্?

মাগধী প্রাকৃত ঃ

ধীবরক ঃ (ভীতনাটিতকেন) পশীদন্তু ভাবমিশ্শা, ণ হগে ঈদিশশ্শ অকয্যশ্কালকে।

বঙ্গানুবাদ ঃ

ধীবরক ঃ মহাশয়েরা প্রসন্ন হউন, আমি এই রকম অকার্য্য করিতে পারি না।[১]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাক্যে পদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে আরম্ভ করেছে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় তা হল নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসেছে।

৬.৪ বেশিরভাগ ভাষাতেই বাক্যগঠনে পদের নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করা হয়। যেমন— ইংরেজিতে-কর্তা- ক্রিয়া-কর্ম আর বাংলায় কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া। যেমন— ইংরেজি- /I go to school/, বাংলা-/আমি স্কুলে যাই/। তবে এই পদক্রমের ব্যতিক্রমও আছে যা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। (দ্র. ৫.৭)

৬.৫ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোর মধ্যে বিশেষত বাংলা এবং তার ভগিনীস্থানীয়া ভাষাগুলোর মধ্যে একটি সাধারণ (Common) মিল রয়েছে, কারণ এই তিনটি ভাষার উৎস মাগধী প্রাকৃত। বাংলা-উড়িয়া-অসমিয়া এই তিনটি ভাষা পূর্বী মাগধী থেকে এসেছে। বাংলার উৎপত্তি আনুমানিক দশম শতক (চর্যার রচনাকাল)। আর আনুমানিক ষোড়শ শতকে অসমিয়া ভাষা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণীকান্ত কাকতির মতে, "Early Assamese : from the fourteenth to the end of the sixteenth century."[২] অসমিয়া ভাষার কিছু পূর্বে উড়িয়া ভাষা স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা পায়। কাজেই এই তিন ভাষার মধ্যে কিছু সাধারণ উপাদানতো থাকবেই। তবে

পার্থক্যও যে একেবারেই নেই তাও নয়। পার্থক্য যেটুকু আছে, তা খুবই সামান্য। এবার একে একে উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

বাচ্য ঃ

বাংলা-উড়িয়া-অসমিয়া এই তিনটি ভাষাতে বাচ্য তিন প্রকারের। কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

কর্তৃবাচ্য ঃ

বাংলা ঃ আমি ভাত খেলাম।

উড়িয়া ঃ মুঁ ভাত খাইলি।

অসমিয়া ঃ মই ভাত খালোঁ।

কর্মবাচ্য ঃ

ক) বাংলা ঃ পণ্ডিতে বলে।

উড়িয়া ঃ পণ্ডিত বোলাএ।

অসমিয়া ঃ পণ্ডিতে কয়।

খ) বাংলা ঃ রামের দ্বারা রাবন হত হল।

উড়িয়া ঃ রাবন রামাঙ্ক দ্বারা হত হেলা।

অসমিয়া ঃ ৰামৰ দ্বাৰা ৰাবন হত হ'ল।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে কর্মবাচ্যের নির্দিষ্ট বিভক্তি ও অনুসর্গ তিনটি ভাষাতেই আছে। বাংলা ও অসমিয়ায়/এ/বিভক্তি, উড়িয়ায়/আ/বিভক্তি; অন্যদিকে বাংলা, অসমিয়া ও উড়িয়ায়/দ্বারা/অনুসর্গ দিয়ে কর্মবাচ্য গঠন করা হচ্ছে। কর্মবাচ্যে এই/এ/বিভক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও ব্যবহৃত হতে দেখি। যেমন—/তিনলোকে ভালে জানি/,দুই হাথে খাইএ/। প্রফেসর সুধাংশুশেখর তুঙ্গর মতে এই/এ/এসেছে প্রভাআ-য়অ>মভাআ-ইজ্জ>প্রাবা-অই> মবা-এ>আবা-এ। অসমিয়াতেও/-এ/ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক বাংলা ভাষার প্রবাদবাক্যের বাক্যগঠনেও এই/-এ/ব্যবহৃত হয়। যেমন— পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়।

তবে আধুনিক বাংলার অন্তর্গত বিভিন্ন উপভাষায় এর ব্যবহার অন্যরকম। যেমন— বাংলা কাছাড়ি উপভাষায় বলে —

কাউয়ায় ধান খায়।

আধুনিক মান্য বাংলায়— কাকে ধান খায়।

ভাববাচ্য ঃ

বাংলা ঃ আমায় যেতে হবে।

অসমিয়া ঃ মোৰ যাব লাগিব।

বাক্যে ক্রিয়াপদের স্থান ঃ

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের নির্দিষ্ট কোন স্থান ছিল না। সংস্কৃত বাক্যে ক্রিয়াপদ বাক্যের যে কোন স্থানে বসতে পারে, বাক্যের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বসানো যায়। তার উদাহরণও আমরা দিয়েছি। (দ্র.৬.২) মধ্য ভারতীয় আর্য অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় সেই স্বাধীনতা ততটা আর রইল না। আর নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্গত বাংলা-অসমিয়া-উড়িয়া এই তিন ভাষাতেই ক্রিয়াপদ সাধারণত বাক্যের শেষে বসে। যেমন—

বাংলা— সে ভাত খেল।
সে ভাত খেয়ে স্কুলে যাবে।
সে টাকা জমা করছে। ইত্যাদি

উড়িয়া— সে ভাত খাইলে।
সে ভাত খাই স্কুলকু যিব।
সে টঙ্কা জমা করিছি।

অসমিয়া— সি ভাত খালে। (স্ত্রীলিঙ্গ হ'লে/ সি/না হয়ে/তাই/হত)
সি ভাত খাই স্কুলত যাব।
সি টকা জমা কৰি আছে।

ক্রিয়ার বিভিন্ন ভাবেও ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে। যেমন—

নির্দেশক ক্রিয়া ভাব ঃ

বাংলা— আমি কাজ করছি।
উড়িয়া— মুঁ কাম করিছি।
অসমিয়া— মই কাম কৰি আছোঁ।

অনুজ্ঞা ভাব ঃ

বাংলা— তুমি কর।

উড়িয়া— তমে কর।

অসমিয়া— তুমি কৰা।

সংযোজক ক্রিয়া ভাব ঃ

বাংলা— সে যখন আসবে আমি তখন যাব।

উড়িয়া— সে যেবে আছিব মুঁ জীবি।

অসমিয়া— সি যেতিয়া আহিব মই তেতিয়া যাম।

বাংলা, উড়িয়া এবং অসমিয়া ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়ন করে দেখা যায় যে এই তিন ভাষাতেই ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে। তবে হ্যাঁ এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। যেমন—

বাংলা ঃ /অমিত ছিল ব্যারিস্টার/, / চলে যাচ্ছ, যাও/, / ভাবছিলুম তুমি কোথায় গেলে/ইত্যাদি। তবে এরকম ব্যবহার কম। (দ্র. ৫.৭) অসমিয়াতেও কখনো-কখনো ক্রিয়াপদ বাক্যমধ্যে তার স্থান পরিবর্তন করে। যেমন— / অমিত আছিল ব্যারিস্টার/, /গৈ আছা নেকি, যোৱা/, / ভাবি আছিলোঁ, তুমি ক'ত গলা/ইত্যাদি।

সরলবাক্যের গুরুত্ব ঃ

যে কোন ভাষার যে কোন কালে সরলবাক্য বেশি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। এমনকি উপভাষায়ও। বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী উপভাষীরা তাঁদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য উপভাষার জটিল বা যৌগিকবাক্য বাবহারের চাইতে সরলবাক্যই বেশি ব্যবহার করেন, তাই আমরা দেখি চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এমনকি বর্তমান লেখ্য মান্য ভাষায়ও সরলবাক্য বেশি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। যেমন—

বেঙ্গ সংসার বড়্হিল জাঅ। (চর্যা- ৩৩)

দিনে দিনে বঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ। (শ্রীকৃকী, পৃ.২)

মুনিগণ তারে নানামতে শিখাইল। (কৃ. রা., পৃ.২৮৯)

বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, পৃ.২৬৭)

বর্তমানেও বাংলা, উড়িয়া এবং অসমিয়া ভাষার বাক্যপ্রকারণের মধ্যে সরল বাক্যের প্রধান্যই বেশি। যেমন—

বাংলা— সে পালিয়ে গেল।

উড়িয়া— সে পলাই গ'ল।

অসমিয়া— সি পলাই গ'ল।

এরকম উদাহরণ অজস্র। কারণ মানুষ নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে যে ধরণের বাক্য ব্যবহার করে তার লেখায়ও বাক্যগঠনের সেই প্রক্রিয়াই ধরা দেয়।

বাক্যগঠনে নঞর্থক ক্রিয়া ঃ

নঞর্থক বাংলা বাক্যগঠনে নঞর্থক ক্রিয়াপদের বা ক্রিয়ার অর্থসূচক নঞর্থক অব্যয়ের স্থান পূর্বে কোথায় ছিল তার আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। (দ্র. ৩.৬)। এবং কবে থেকে এই নঞর্থক ক্রিয়ার অর্থসূচক নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পরে বসতে শুরু করে তাও আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। (দ্র. ৪.৫)। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রাকৃতে নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসত, প্রাচীন বাংলা এবং আদি মধ্য বাংলাতেও নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বেই বসত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজির প্রভাবে নঞর্থক অব্যয় বেশির ভাগ সময় ক্রিয়ার পরে বসতে শুরু করল। তবে বর্তমান বাংলা ভাষায় কখনোই যে ক্রিয়াপদের পূর্বে নঞর্থক অব্যয় বসে না তা নয়। যেমন—

১. না চাহিলে যারে পাওয়া যায়।[৪]

২. না না কাজ নাই, যেয়ো না বাছা—[৫]

৩. নাই বা ডাকো রইব তোমার দ্বারে।[৬]

বাংলার অনেক উপভাষায় এখনো নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন— চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুজ্ঞায় নঞর্থক ক্রিয়াপদের অর্থসূচক নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসে। উদাহরণ— এরে বাউ এহুহুরের জল না খাইঅ জে, হেডে গুরগুরি কইরবো।

(মান্য বাংলা— এই বাপু এই পুকুরের জল খেও না, পেটে গুরগুর করবে)[৭]

সাধারণত বাংলা ভাষায় নঞর্থক অব্যয় যেখানে নঞর্থক ক্রিয়াপদের পরে বসে, সেখানে উড়িয়া, অসমিয়া ভাষায় তা ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। যেমন—

উড়িয়া— নাই খেলবু। কাইকু নাই খেলবু?

অসমিয়া— নেখেলা? কিয় নেখেলা?

তবে Negative Perfect-এ বাংলা, উড়িয়া, অসমিয়া— এই তিন ভাষাতেই ক্রিয়ার Negative Perfect ক্রিয়াপদের শেষে বা বলতে পারি বাক্যের শেষে বসে। যেমন—

বাংলা— সে ঘরে নাই।

উড়িয়া— সে ঘরে নাহি।

অসমিয়া— সি ঘৰত নাই।

এরকম উদাহরণ অজস্র। বাংলা ভাষায় নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়াপদের শেষে বসেছে ইংরেজির প্রভাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বাংলা ভাষা ইংরেজি ভাষার সংস্পর্শে এসেছিল। অনেক ইংরেজ পণ্ডিত সিভিলিয়ানরা তাঁদের গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করিছিলেন। তাই তাঁদের ভাষার প্রভাব (বাক্যপ্রকরণগত) এতে পড়েছে। পড়াটা স্বাভাবিক। উপরন্তু সেই সময়ে অনেক শিক্ষিত বাঙালি ছিলেন যাঁরা নব্য ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কলম ধরে ছিলেন। এদিকে কলকাতা ছিল সেই সময়ে ইংরেজদের রাজধানী, কাজেই ইংরেজি ভাষার প্রভাব এতে যে একটু পড়বে তা স্বাভাবিক।

(বি.দ্র. এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত উড়িয়া ভাষার সমস্ত উদাহরণ দীপ্তি ফুকন পাটগিরি রচিত 'অসমীয়া, বাংলা আৰু উড়িয়া ভাষা ঃ তুলনামূলক অধ্যয়ন' নামক বই থেকে নেওয়া)

তথ্যসূত্র

১. ভট্টাচার্য, দেবীপদ, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা, পৃ.২২৪

২. Kakati. Banikanta; Assamese, Its Formation and Development; P.13

৩. Tunga. S.S., BORDSA, P. 301

৪. ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, পৃ.৩৭৬

৫. ঐ, পৃ.৬২০

৬. ঐ, পৃ.৬৬

৭. সাহা. জয়ন্তী, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ বাংলা ভাষা ঃ এটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা; ড° দাস. বিশ্বজিৎ আৰু ড° বসুমতাৰী. ফুকন চন্দ্র (সম্পা.), অসমীয়া আৰু অসমৰ ভাষা, পৃ.৫৩

৮. পাটগিৰি. দীপ্তি ফুকন; অসমীয়া, বাংলা আৰু উড়িয়া ভাষা ঃ তুলনামূলক অধ্যয়ন, পৃ.১৩০-১৩৫

সপ্তম অধ্যায়

৭. উপসংহার ঃ বাংলা ভাষার বাক্যগঠন পদ্ধতির মূল্যায়ন

আমরা আমাদের আলোচনার বিষয় বলতে গেলে পূর্ববর্তী অধ্যয়নগুলোই সেরে ফেলেছি। এখানে বলবার মত বিশেষ কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, সব আলোচনা যে সমানভাবে করতে পেরেছি সে ওকালতি করব না। সব আলোচনার গভীরে সমানভাবে প্রবেশ করাও সম্ভব নয়। কারণ, তথ্যের অপ্রতুলতা, যোগাত্যর সীমাবদ্ধতা। তবে যতুটকু সম্ভব সবটাই উজার করে দিয়েছি।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মাগধী প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ, মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা, উড়িয়া, অসমিয়া এই তিন ভাষার উৎপত্তি। তার মধ্যে বাংলা ভাষার উৎপত্তি আগে হয়েছে। তার বয়স হাজার পার করেছে। আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি এই হাজার বছরে এই ভাষার বাক্যগঠন পদ্ধতির কি কি পরিবর্তন হয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে কি কি ঐতিহ্য এই ভাষা বহন করছে, আর বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে এসে সে কি কি গ্রহণ করেছে।

আমরা দেখেছি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অনেক কিছুই সে আজও বহন করছে। যেমন— প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় ক্রিয়াহীন বাক্য ছিল। বাংলা ভাষায় আজও তা বর্তমান। যেমন—

সংস্কৃত— সীতা সুশীলা বালিকা।

বাংলা— সীতা ভাল মেয়ে।

এই বৈশিষ্ট্য বাংলার অন্য দুই ভগিনী স্থানীয়া ভাষা উড়িয়া ও অসমিয়ায় বর্তমান। থাকাটা স্বাভাবিক কারণ এই তিন ভাষার উৎস একই। হয়তো এই কারণেই বাংলা ভাষা দীর্ঘদিন বঙ্গ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, যেমন— কোচবিহার, কাছাড়,অসম (তৎকালীন) প্রভৃতি অঞ্চলে লিঙ্গুয়াফ্রঙ্কার কাজ করত।

এই তিন ভাষার শব্দভাণ্ডারেও অনেক মিল আছে। এমন অনেক common শব্দ আছে যা এই তিন ভাষায় ব্যবহৃত হয়। আবার অনেক নতুন শব্দও এই তিন ভাষার শব্দভাণ্ডরে প্রবেশ করেছে। যাইহোক ফিরে আসছি বাক্যগঠনের আলোচনায়। ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত বাক্যগঠনের এমন কয়েকটি দিক আছে যা প্রাচীন বাংলা এবং মধ্য বাংলায় ব্যবহৃত হত, কিন্তু বর্তমান মান্য বাংলায় ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু বর্তমানে মান্য উড়িয়া ভাষা বা অসমিয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন— বাক্যগঠনে নঞর্থক ক্রিয়াপদের স্থান— এই বিষয়ে উড়িয়া ও অসমিয়া ভাষা ঐতিহ্যানুসারী। কিন্তু, বাংলা ইংরেজি ভাষার সংস্পর্শে ঐতিহ্য থেকে সরে এসে বাক্যগঠনে নঞর্থক ক্রিয়াপদে নঞর্থক অব্যয়ের স্থান বদলে ফেলল। এই পরিবর্তন স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন।

বাক্যগঠনের আলোচনায় দেখা গেল যে বাংলা ভাষায় বাক্যগঠন পদ্ধতি একদিকে যেমন

ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে অপরদিকে বিদেশ থেকে আগত বিদেশি ভাষার (ইংরেজি ভাষা) বাক্যগঠনকেও সে সাদরে গ্রহণ করেছে। এই ভাষার ধারণ করার এবং গ্রহণ করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। সে কোন শক্তিশালী ভাষারই এটা থাকে। হয়তো এই কারণে বাংলা ভাষা ভাষিক অবস্থানের দিক থেকে পৃথিবীর মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ঐতিহ্য প্রাচীন এবং মূল্যবান, বাংলার নবজাগরণে বাংলা ভাষা-সাহিত্য এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে আমাদের মনীষীগণ বহু যত্নে বহু শ্রমে এই ভাষার লেখ্য রূপের এক সুন্দর বাক্যগঠন পদ্ধতি গড়ে তুলেছেন। বাংলা ভাষার বাক্যগঠন পদ্ধতি আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁচেছে তাকেও চরম বলে মনে হয় না। বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য ভাষার প্রভাব ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাবে বাংলা ভাষায় নিত্য-নতুন শব্দ প্রবেশ করছে। যেমন— আজকাল ইন্টারনেটের যুগে অনেক ছেলেমেয়ে তাদের ভাষার এই নেটের তথা কম্পুটারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দ অনেক সময় তাদের কথ্য ভাষায় ব্যবহার করে। যেমন— 'ভুল যাওয়া' অর্থে সে বলে 'এটা একেবারে ডিলেট হয়ে গেছে', 'নকল করা' অর্থে 'কপি পেস্ট' ইত্যাদি শব্দ বা বাক্যাংশ কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে, আর কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত রূপই ধীরে ধীরে চলে আসে লেখ্যভাষায়। পরিবর্তন একটা জীবন্ত ভাষায় পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ ভাষা বহতা নদীর মত।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ ঃ

আলী. সৈয়দ মুজতবা, দেশে-বিদেশে, কলকাতা, ১৪১৪

কামিল্য. মিহির চৌধুরী (সম্পাদিত), নব চর্যাপদ, কলকাতা, ১৪০৩

কামিল্য. মিহির চৌধুরী (সম্পাদিত), ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কলকাতা, ২০১০

চট্টোপাধ্যায়. বঙ্কিমচন্দ্র, কপালকুণ্ডলা (শশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৯৯১

—, কমলাকান্তের দপ্তর, কলকাতা, ১৯৯৭

—, কৃষ্ণকান্তের উইল (শশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৯৯১

—, রাজসিংহ (ভবানীগোপাল সান্যাল সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৯৮৬

—, রাধারাণী ও যুগলাঙ্গুরীয়, কলিকাতা, ১৩৯৯,

চট্টোপাধ্যায়. সুনীতিকুমার, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৬

জানা. নরেশচন্দ্র (সম্পাদিত), শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কলকাতা, ১৯৯৬

ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৪

—, গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৯৪

—, গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৬

—, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০২

—, গীতাঞ্জলি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭

—, ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৪

—, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৯৬

—, বলাকা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৯৫

—, শেষের কবিতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৯৫

—, সোনার তরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৯০

—, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১০

—, রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১০

তুঙ্গ. সুধাংশুশেখর, বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা ঃ ষোড়শ অষ্টাদশ শতক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৫

দাশ. শিশিরকুমার, গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব, কলকাতা, ১৯৯৭

বন্দ্যোপাধ্যায়. অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৯৬

—, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (পঞ্চম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৮৫

—, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, ১৯৮৯

—, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৩৯৫

বসু.ত্রিপুরা, দুশো বছরের বাংলা নথিপত্র, কলকাতা, ২০০৯

বিদ্যাসাগর. ঈশ্বরচন্দ্র, বেতালপঞ্চবিংশতি, কলকাতা, ১৯৭৩

—, শকুন্তলা, কলকাতা, ২০১২

—, সীতার বনবাস, কলকাতা, ১৩৬৬

বিদ্বদ্বল্লভ. বসন্তরঞ্জন রায় (সম্পাদিত), শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ চণ্ডীদাস বিরচিত, কলকাতা, ১৩৬১

ভট্টাচার্য. দেবীপদ, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা, গুয়াহাটী, ১৯৬৫

ভট্টাচার্য. সুভাষ, বাঙালির ভাষা, কলকাতা, ২০১০

মজুমদার. অতীন্দ্র, চর্যাপদ, কলকাতা, ১৯৯৩

মজুমদার. পরেশচন্দ্র, বাংলা ভাষা পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড) কলকাতা, ১৯৯২

মজুমদার. সুবোধচন্দ্র (সম্পাদিত), কৃত্তিবাস রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ, কলিকাতা, ১৯৯৬

মুখোপাধ্যায়. অরুণকুমার, বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, কলকাতা, ২০০০

মুখোপাধ্যায়. তারাপদ ও সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কলিকাতা, ১৩৯৭

মুখাপাধ্যায়. ধ্রুবকুমার (সম্পাদিত), শাক্তপদাবলী, কলকাতা, ১৯৯৯

শাস্ত্রী. হরপ্রসাদ (সম্পাদিত), হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, কলকাতা, ২০০০

সিংহ. কালীপ্রসন্ন, হুতোম প্যাচার নকশা (অরুণ নাগ সম্পাদিত), কলকাতা, ১৪০৩

সেন. নীলরতন (সম্পাদিত), চর্যাগীতি কোষ, কলকাতা, ২০১০

সেন. সুকুমার (সম্পাদিত), চর্যাগীতি পদাবলী, কলকাতা, ১৯৭৩

সেন. সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৯৫

সেন. সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৯৮৭

অসমিয়া সহায়ক গ্রন্থ ঃ

গোস্বামী. উপেন্দ্র নাথ, অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱ, সমৃদ্ধি আৰু বিকাশ, গুৱাহাটী, ২০০৮

দাস. বিশ্বজিৎ আৰু বসুমতাৰী. ফুকন চন্দ্র (সম্পাদিত), অসমীয়া আৰু অসমৰ ভাষা, গুৱাহাটী, ২০১০

পাটগিৰি. দীপ্তি ফুকন; অসমীয়া, বাংলা আৰু উড়িয়া ভাষা ঃ তুলনামূলক অধ্যয়ন, গুৱাহাটী, ২০০৪

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ ঃ

Chatterjee. Suniti Kumar, the Origin and Development of Bengali Language, Calcutta, 1993

Kakati. Banikanta; Assamese, Its Formation and Development, Guwahati, 1995

Tunga. S.S., Bengali and other Related Dialects of South Assam, New Delhi, 1995

সহায়ক ম্যাগজিন ঃ

মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন, দশদিশি

Vol.-1, Issue-2, কলকাতা, অক্টোবর ২০১২-২০১৩